দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

দেশের স্বার্থেই সংবিধানের কিছু ধারা পরিবর্তন করা উচিত — পৃঃ ১১

ভারতের সংবিধানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন — পৃঃ ২৩

৭৮ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬।। ১২ মাঘ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা

৭৮ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ১২ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৬ জানুয়ারি - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

রাজকাজে বাধা দান, রাজা-অমাত্যের মৃত্যুদণ্ডের সমান : ঘুঘু বনাম ফাঁদ ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

ভাইপোটা'র বড়ো বাড় বেড়েছে ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

জয় সোমনাথ! ☐ ড. মনমোহন বৈদ্য ☐ ৮

শিল্পোন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাকেন্দ্রের পরিবর্তন আশু প্রয়োজন ☐ কৌটিল্য ☐ ১০

দেশের স্বার্থেই সংবিধানের কিছু ধারা পরিবর্তন করা উচিত ☐ ডাঃ মধুসূদন পাল ☐ ১১

ভারতীয় সংবিধানের অর্থ উপলব্ধি আজ সময়ের দাবি ☐ দেবাশিস লাহিড়ী ☐ ১৩

স্বয়ংসেবকদের নাগরিক কর্তব্যই সংবিধানের মৌলিক কর্তব্য ☐ শ্রীনিবাস ☐ ১৫

বার বার সংবিধান অপমানিত হয়েছে কংগ্রেসি শাসনকালে ☐ পুলকনারায়ণ ধর ☐ ১৭

ভারতের সংবিধানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন ☐ লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা 'লক্ষ্মীদা' ☐ ২৩

বিজলি ঝলকের চমক 'বিজলী'র পাতায় ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

শ্রীরামকৃষ্ণের তুলসীপ্রীতি এবং কাঁকুড়গাছির তুলসীকানন ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ৩৪

পরিবর্তনের ঢেউ : ইরান থেকে ভারত, গাজওয়া-এ-হিন্দের মিথ এবং আধুনিকতার আহ্বান ☐ বরুণ মণ্ডল ☐ ৩৫

ভয়ের রাজনীতি থেকে ফাইল-দখলের মরিয়া চেষ্টা ☐ অরুণ চক্রবর্তী ☐ ৩৭

ভারতীয় সংবিধানের আত্মাকে ধ্বংসের প্রয়াস করেছে কংগ্রেস ☐ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় ☐ ৪৩

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ ☐ খেলা : ৩৯ ☐ রঙ্গম : ৪১ ☐

প্রকাশিত হবে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শাসক দলের মদতে রাজ্যজুড়ে নৈরাজ্য

শাসক দলের মদতে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে নৈরাজ্য। এসআইআরের শুনানির বিরোধিতার অজুহাতে পথ অবরোধ, সরকারি দপ্তরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, রেল লাইনের ক্ষতিসাধন, সাংবাদিক পেটানো— সবই চলছে অবাধে। কাউকে কাউকে আবার প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ নির্বাক দর্শকের ভূমিকায়। মানুষ এটা ভেবেই আতঙ্কিত যে, এখনই যদি এত অশান্তি তাহলে ভোটপর্বে কী চেহারা নেবে এই দুষ্কৃতী তাণ্ডব?
স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প

অনেক রক্ত, অনেক প্রাণের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। যাঁহারা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য প্রাণ বলিদান করিয়াছেন তাঁহাদের উত্তরপুরুষদিগের নিকট সেই স্বাধীনতা কোনো আনন্দ উল্লাসের পর্ব ছিল না। কেননা তাহারা নূতন করিয়া পরাধীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। বঙ্গভূমির এক বিস্তীর্ণ অংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণে বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাস্টারদা সূর্য সেন- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারদিগের পরিবার সেই স্বাধীনতার আস্বাদ পান নাই। খণ্ডিত ভারতভূমির নাগরিকগণও সেই স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহা কীরূপ স্বাধীনতা যে, যাহারা ভারতভূমিকে পরাধীন রাখিয়াছিল সেই ইংল্যান্ড-রাজের নামেই জওহরলাল নেহরু ও চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীকে শপথগ্রহণ করিতে হইয়ছিল! 'স্বাধীনতা' বলা হইলেও তাহা ছিল একপ্রকার ক্ষমতা হস্তান্তর মাত্র। তখন ভারত ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য বা অধিরাজ্য। তখনও ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের প্রতিনিধি রূপেই গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন রাজাগোপালাচারী ও নেহরু। এমনকী ভারতের শাসনকর্তা ও সেনাপ্রধানও ছিলেন ব্রিটিশ রাজপুরুষ। তখনও দেশের প্রশাসনিক ভবনে উড্ডীন ছিল ইউনিয়ন জ্যাক। স্বাধীনতা লাভ করিলেও তখনও ভারতবাসী ব্রিটিশের ভারত শাসন আইন অনুসারেই শাসিত হইতেছিল। স্বাধীনতার নামে তখন একপ্রকার পরাধীনতারই জীবনযাপন করিতে হইয়াছে ভারতবাসীকে। এই অবস্থা প্রায় আড়াই বৎসরকাল চলিয়াছিল। ইহার পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশে সংবিধান কার্যকরী হইবার পর ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ডোমিনিয়ন ভারত পরিবর্তিত হইয়াছে গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতে। এই বৎসর ৭৭তম ভারতীয় সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হইতেছে।

১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বরাজ দিবস' উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বস্তুত, ২৬ জানুয়ারিই প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস। এই দিন হইতে ভারতবাসী স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করিয়া সংবিধান কার্যকরী করিয়াছে। সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি অনুসারেই সংবিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সংবিধান তৎকালীন কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ না হইবার কারণে দেশে স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করা হয় নাই। অবশ্য সেই সদিচ্ছাও ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় যে, সংবিধান কার্যকরী হইবার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করিয়াছেন। দীর্ঘ কংগ্রেসি শাসনে এইভাবে বহুবার তাহারা সংবিধান সংশোধন করিয়াছেন। জওহরলাল দুহিতা ইন্দিরা গান্ধী তো সংবিধানের আত্মাকেই ছুরিকাঘাত করিয়াছেন। দেশে জরুরি অবস্থা জারি করিয়া বিরোধীশূন্য লোকসভায় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেকুলার' ও 'সোশ্যালিস্ট' শব্দদ্বয়ের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাজীব গান্ধী শুধুমাত্র ভোটব্যাংকের লোভে সংবিধান সংশোধন করিয়া দুই মুসলমান মহিলাকে তাঁহাদের প্রাপ্য ন্যায়বিচার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

সংবিধান হইল দেশের পবিত্র আচার সংহিতা। দীর্ঘ কংগ্রেসি শাসনে দেশবাসীকে জানিতে দেওয়া হয় নাই, হস্তলিখিত সংবিধানের হিন্দি ও ইংরাজি ভায়ায় মূল সংস্করণের কথা। তাহাতে ২২টি অধ্যায়ে যে ২২টি ভারত সংস্কৃতির চিত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে তাহার কথাও তাহারা কোনোদিন প্রকাশ করেন নাই। দেশবাসীর সৌভাগ্য যে,২০১৪ সাল হইতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের সৌজন্যে দেশবাসী মূল সংবিধানের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছে। কংগ্রেস পারিবারিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বারংবার ক্ষমতা অপব্যবহার-পূর্বক ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে এবং কংগ্রেসকৃত পাপের স্খালন করিবার জন্যই সংবিধান সংশোধন করিতেছে। একথা সকলে স্বীকার করিবেন যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃতার্থেই দেশে স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছে। ইতিমধ্যে দেশকে পরাধীনতার সর্বপ্রকার মানসিকতা ও গ্লানি হইতে মুক্ত করিবার জন্য নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিয়াছে কেন্দ্র। ইহা স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ্য করিতে পারিতেছে না। কেননা, তাহারা অদ্যাবধি ঔপনিবেশিক মানসিকতা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আগামী দশ বৎসরের মধ্যে জাতিকে পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত করিবার কথা বলিয়াছেন। দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন, ইহাই একটি স্বাধীন জাতির পরিচয়।

সুভাষিতম্

তৈলাদ্ রক্ষেৎ জলাদ্ রক্ষেৎ রক্ষেৎ শিথিলবন্ধনাৎ।
মূর্খহস্তে ন দাতব্যম্ এবং বদতি পুস্তকম্।।

অর্থ ঃ পুস্তক বলছে, আমাকে তেল থেকে রক্ষা করো, জল থেকে রক্ষা করো, শিথিল বন্ধন থেকে রক্ষা করো এবং কখনো আমাকে কোনো মূর্খের হাতে সমর্পণ করবে না।

রাজকাজে বাধা দান, রাজা-অমাত্যের মৃত্যুদণ্ডের সমান

ঘুঘু বনাম ফাঁদ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন হয় তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পর তৃণমূলনেত্রী এবং তার দলের চূড়ান্ত দুর্নীতি, অপশাসন ও জেহাদি তোষণের সাক্ষী থাকে রাজ্যবাসী। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, গোরু-বালি-পাথর-কয়লা চোরাচালান, রেশনের খাদ্যসামগ্রী চুরি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ও একশো দিনের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি, আম্ফান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ত্রাণসামগ্রী লুঠ, স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি, ডাঃ অভয়া হত্যাকাণ্ড, খাগড়াগড় কাণ্ড-সহ অসংখ্য চুরি, দুর্নীতি ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে নবান্ন। রাজ্যের শাসক দলের পক্ষ থেকে জেহাদি তোষণের ফলে বিভিন্ন জেলায় মঠ-মন্দিরে আক্রমণ, দেবদেবীর প্রতিমা, দুর্গামণ্ডপ ভাঙচুর, হিন্দুদের বাড়ি ও দোকানঘর লুঠ, অগ্নিসংযোগ, হিন্দু মহিলাদের সম্ভ্রমহানির ঘটনা বিগত ১৫ বছরে মাত্রাছাড়া হয়েছে। শিল্প শ্মশানে পরিণত হয়েছে আজ পশ্চিমবঙ্গ। বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে রাজ্যের লক্ষ-লক্ষ যুবক পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীদের একাংশ আরও একটু রাজনীতি সচেতন হলে, বিভিন্ন ভাতার ফাঁদে তারা না পড়লে, রাজ্য সরকারি দান-খয়রাতির মুখাপেক্ষী তারা না হলে ২০২১ সালেই তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক ছুটি হয়ে যেত। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টির তিন-চারজন সর্বভারতীয় মুখ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করার কারণে 'বহিরাগত তত্ত্ব' সামনে আনে তৃণমূল। প্রশান্ত কিশোর, প্রতীক জৈন, শত্রুঘ্ন সিনহা, কীর্তি আজাদরা তাদের চোখে 'বহিরাগত' নয়। রাজ্যে আসন্ন ভোটে সেই পুরোনো তত্ত্বকেই নতুন বোতলে পুরোনো মদ হিসেবে পরিবেশন করতে চাইছে তৃণমূল। বাঙ্গালি অস্মিতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ফের নেশাচ্ছন্ন করতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারতীয় জনতা পার্টির। কথায় বলে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'।

কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ও মনীষীদের শ্রদ্ধা করেন। বাঙ্গালি নেতৃত্বের মধ্যে থেকে উঠে আসা প্রয়োজন একটি মুখের, যাতে ভোট জয়ের কাছাকাছি এসে শেষমেশ ভোটে জেতা সম্ভব হয়। নীতিগতভাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে অসম্মান করে ভোটের তেজপাতা হিসেবে তাদের ব্যবহার করে না বিজেপি। ১৯৮০ সালে বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একজন মুসলমান নেতা— সিকন্দর বখত (১৯৮০-১৯৮২)। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির লড়াই কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নয়। সেই লড়াই দুরাত্মাদের বিরুদ্ধে। সেই দুরাত্মাদের দল আর প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এই লড়াই যতটা কঠিন ততটাই সহজ। দুরাত্মারা ইঁদুরের মতো। ছলের ধারাবাহিকতা মেনে একবগ্গা লাইনে চলে। সেই সাপ্লাই লাইন কাটতে কৌশল প্রয়োজন। কেবল কোনো সাংস্কৃতিক ভাবনা থেকে কার্যকর করতে হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে তাদের রোখা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। আর যদিও-বা তা করা যায় তা সময়সাপেক্ষ। কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব এই বিষয়টি সত্বর উপলব্ধি করলে এই রাজ্যে বিজেপির জয় ততই নিশ্চিত হবে আর বিজেপিও এই রাজ্যে স্থায়ীভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পাবে। রাজ্যপাটের কলামে আগেও উল্লেখিত হয়েছে যে, বিরোধী নেত্রী হিসেবে তৃণমূলনেত্রী কখনও জেল খাটেননি বা লক-আপে রাত কাটাননি। বিদেশি সিপিএম কোনোদিন তার বিরুদ্ধে কোনো যুৎসই মামলা করেনি। সিপিএম জমানায় তাকে কোনো ঘুঘু দেখতে হয়নি। অনেকটা ফাঁকতালে নেত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সুপ্রিম আদালতে তার সেই নকল মুখোশ খসে পড়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত আটকাতে কলকাতা পুলিশের দায়ের করা চারটে ফৌজদারি অভিযোগ বাতিল করে দিয়ে সর্বোচ্চ আদালত বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রী কতটা হিংসাপরায়ণ আর রাজ্যকে তিনি কোন মিথ্যার গাড্ডায় ফেলেছেন। চাণক্যের ভাষায় রাজকার্য আটকে তিনি নিজেকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত করেছেন।

জালিয়াতি ও তস্করবৃত্তির মধ্যে দিয়ে এখানকার শাসন চলছে। এ অভিযোগ বর্তমানে কেবলমাত্র বিরোধী দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সাধারণ মানুষও তাই বলছেন। তবে ভোট বাক্সে তারা তা লিখবেন কিনা সেটাই দেখার। কথায় বলে 'শতং বদ মা লিখ'। ভোট হলো সেই লেখার খেলা। ২০২১ ও '২৪-এর পর সে খেলায় তৃণমূল ২-০-তে এগিয়ে রয়েছে। হ্যাটট্রিক আটকাতে বিজেপিকে ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন জিততে হবে। তারা যদি ২-১ করতে পারে, তাহলে এই বছরই অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কলকাতা পুরসভার ভোট জিতে ফলাফল ২-২ করারও ক্ষমতা তারা রাখে। তারপর এই রাজ্যে বিজেপিকে হারানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। বাঙ্গালি এমনিতেই 'নো চেঞ্জিং' ঘরানার প্রজাতি। কংগ্রেস, সিপিএম— এই দু'টি রাজনৈতিক দলকে দিয়ে তাই প্রমাণ হয়েছে। এর বিপ্রতীপে তৃণমূল কার্যত একটি ক্লাবজাতীয় সংগঠন; প্রকৃতপক্ষে কোনো রাজনৈতিক দল না হওয়ায় তারা স্বতন্ত্র। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের ফলাফলের পর বিজেপি যেভাবে তেড়েফুঁড়ে পাঁচটি রাজ্য জিতেছে, তাতে মনে হয় এই মুহূর্তে বিজেপির গতিরোধ করা অসম্ভব। ঝাড়খণ্ডে বিজেপি কিছু রাজনৈতিক কৌশলগত ভুলের কারণে পরাজিত হয়। আর তারপর থেকেই তৃণমূলের ঝাড়খণ্ড প্রীতি বেড়ে গিয়েছে। এখন তারা সব বিষয়ে ওই রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। চড়া দামে সেই রাজ্যের হেলিকপ্টার ভাড়া করে নির্বাচনী প্রচার করছে তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা। ১৯৯৩-এর ২১ জুলাই কলকাতায় বা ২০০৭-এর ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে গুলি চলার সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন না তৎকালীন বিরোধী নেত্রী। অথচ আন্দোলনের সাফল্যের অংশীদার হয়েছিলেন। সেই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা শুভেন্দু অধিকারী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। বিদেশি সিপিএম তৃণমূলনেত্রীর ভিটেতে কোনোদিন ঘুঘু চরায়নি। প্রতিদানে তৃণমূলও সিপিএমের ওপর দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া বড়ো কোনো প্রত্যাঘাত করেনি। বিরোধী ভোট বিভাজনের মাধ্যমে তারা এখন তৃণমূলকে জেতাচ্ছে। তৃণমূল কখনও ঘুঘু দেখেনি। আবার ফাঁদও দেখেনি। ২০২৬-এ তার একটিও দেখবে?

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ভাইপোটা'র বড়ো বাড় বেড়েছে

কোণঠাসাযু দিদি,

একেই আইপ্যাক, কয়লা পাচারের টাকা, বিদেশি ব্যাংকের খোঁজ, ইডি, সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে আপনি চাপে। তার উপরে রয়েছে সিবিআই তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার জোর সম্ভাবনা। তার উপরে ভাইপোর চ্যালেঞ্জ। কিন্তু দিদি আপনি কেন সহ্য করছেন কে জানে! অপত্য স্নেহ এতটা!

২৯৪ আসনের মধ্যে বেছে বেছে শুধু নন্দীগ্রামে ভাইপো সেবা করতে গেছেন। কেন! পিসি হেরেছিলেন বলে! পিসির কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! নাকি শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। নন্দীগ্রামে এই কর্মসূচি কেন! এই টাকা কোথা থেকে আসছে তার হিসাব চেয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দুবাবু। দিদি আপনার সুরেই ভাইপো পালটা বলেছেন, 'উনি হিসাব চাওয়ার কে? হিসাব ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে দেব। অন্য কোনো কেন্দ্রীয় এজেন্সি চাইলে তাদের দেব।' সেটা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু বছর খানেক আগেই তো এই সব খরচের উৎস জানতে চেয়ে আয়কর দপ্তরের জোড়া চিঠি পেয়েছিলেন তিনি। তার যে কী হয়েছিল!

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে প্রবীণদের জন্য ২০২২-২৩ সালে অভিষেক 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' প্রকল্পটির সূচনা করেন। এই প্রকল্প নিয়েই গত বছরের ৭ জানুয়ারি এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি আয়কর দপ্তর দু'টি চিঠি পাঠায়। ৭৬ হাজার প্রবীণ নাগরিককে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়ার টাকা কোথা থেকে এল দিদি! তাছাড়া আপনার রাজ্যে আপনি তো বার্ধক্য ভাতা দেন। তার উপরে তিনি কেন দিচ্ছেন! এটা তো আপনাকে এড়িয়ে আলাদা সরকার চালানোর মতো!

দিদি, গত বছর জানুয়ারি মাসে সেবাশ্রয়ের পরিসংখ্যানের কথা বলতে গিয়ে আপনার ভাইপো জানিয়েছেন, মাত্র একটি দিনে ফলতার ৪০টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ১৩ হাজার ৪৯৩ জনের চিকিৎসা হয়েছে। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা তো বটেই, ওষুধপত্রও দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত ক্যাম্প থেকে। অভিষেক বলেন, 'শুধু কথায় নয়, কাজ দিয়ে প্রশাসনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।' আমার না দিদি, কেমন মনে হয়েছিল এটা আপনাকে খোঁটা দিয়েই বলা।

২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে ২০১৩ সালেই তো আপনি নন্দীগ্রামকে স্বাস্থ্যজেলা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং আপনার কথামতো ৫৫ কোটি টাকা খরচে ২০১৫ সালে তৈরি হয় নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। বিরোধীরা বলে, নামে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হলেও প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবাটুকুও এখানে মেলে না। ফলে ভরসা হারানো মানুষজনকে ছুটতে হয় জেলা সদরে। স্থানীয়রা বলেন, সুপার স্পেশালিটি নাম না দিয়ে ওটাকে শুধুমাত্র মাতৃসদন বললেই হয়।

বিনা খরচে নিজস্ব ডাক্তার, নিজস্ব ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শিবির মানে তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী পিসিকেই চ্যালেঞ্জ করা। নিজের লোকসভা এলাকায় করুক কিন্তু নন্দীগ্রামে যাবে কেন! রাজ্যে তো অনেক বিধানসভা এলাকায় হাসপাতালই নেই। সেখানে গেলেই তো হয়। আসলে আপনি কেন হেরেছিলেন সেটা স্পষ্ট করে দিতেই নন্দীগ্রামে যাওয়া।

সে সব তো বিরোধীরা বলে। কিন্তু ভাইপো সেখানে গিয়ে বিনা খরচে নিজস্ব ডাক্তার, নিজস্ব ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শিবির মানে তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী পিসিকেই চ্যালেঞ্জ করা। নিজের লোকসভা এলাকায় করুক কিন্তু নন্দীগ্রামে যাবে কেন! রাজ্যে তো অনেক বিধানসভা এলাকায় হাসপাতালই নেই। সেখানে গেলেই তো হয়। আসলে আপনি কেন হেরেছিলেন সেটা স্পষ্ট করে দিতেই নন্দীগ্রামে যাওয়া। রাগ করবেন না দিদি, আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটাই বললাম।

দিদি আপনার রাজনৈতিক উত্থানের অন্যতম 'সিঁড়ি' হলেও গত কয়েক বছর ধরেই এই জনপদে তৃণমূলের সংগঠনে কোন্দল বিরাজ করছে। নানাবিধ ওষুধ প্রয়োগ করেও তা সারানো যায়নি। কোন্দলের কারণে আলগা হওয়া সংগঠনের নমুনা প্রত্যক্ষ করা গেল ভাইপোর শিবির দেখেও। নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের তুলনায় ১ নম্বর ব্লকের সেবাশ্রয় শিবিরে স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়, উপস্থিতি সব সূচতেই নাকি এগিয়ে ছিল। অভিষেকের সেবা দেখানোর জন্য সাংগঠনিক ভাবে যে জমায়েত তৃণমূল করেছিল, তাতে এগিয়ে রইল ১ নম্বর ব্লক। মানে যেখানে মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। ভোটের আগে সেবাশ্রয়ের মাধ্যমে নন্দীগ্রামের কোন্দলে মলম লাগাতে চাইছেন নাকি ভাইপো! দিদি আপনিই সেটা ভালো বুঝবেন। তবে অভিষেককে যেন প্রার্থী করবেন না। আমার হিসেব বলছে, তাতে একই পরিবারের দু'জনের পর পর হার হবে নন্দীগ্রামে। আপনার ছোটো বোন নন্দীগ্রামের নামটাই না তৃণমূলের 'হারগ্রাম' হয়ে যায়। ভয় করে দিদি ভয়। □

অতিথি কলম

ড. মনমোহন বৈদ্য

জয় সোমনাথ !

৬০ বছর ধরে একটি দলেরই নিরবচ্ছিন্ন শাসনের কারণে দেশের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে এরকম একটি অভারতীয় প্রতিহিংসার রাজনীতির আমদানি হয়েছে। এজন্যই অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় নেহরু মানসিকতার মানুষেরাই সারা দেশে বিরোধিতা শুরু করেছিলেন।

১৯৫১ সালে সৌরাষ্ট্রের (গুজরাট) ভেরাবলে বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের হাতে হয়েছিল। সেই সময় সরদার প্যাটেল, কে এম মুনশী, বি পি মেনন, ড, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতো বিশিষ্ট নেতারা সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণকে ভারতবাসীর চিরন্তন অস্মিতা এবং গৌরবের প্রতীক মনে করেছিলেন।

তবে পণ্ডিত নেহরুর মতো একজন নেতা এই ঘটনার বিরোধিতা করে একে 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদ' বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই সময় এসব বিতর্কের কথা কানহাইয়ালাল মুনশী তাঁর 'পিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। এই বইটি পড়লে আমরা ভারত ইতিহাসের তাৎপর্য এবং তার বিরোধিতার বিষয়ে বুঝতে পারব। যেহেতু অযোধ্যার শ্রীরামমন্দিরের মতো সোমনাথ মন্দিরও ইসলামি আক্রমণকারীদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল, তাই শ্রীমুনশীর পুস্তকের ওই অংশটি আজকের প্রেক্ষাপটেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি রাষ্ট্র ভাবনার বিপরীতে রাজনীতির একটি ক্ষুদ্র অংশের সংকীর্ণতাকে তুলে ধরতে সক্ষম।

কে এম মুনশী লিখেছেন, ' ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে আমি মন্দিরটিকে ভয়ঙ্কর জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখতে পাই— অপবিত্র, পুড়ে বিবর্ণ হওয়া, তবু স্তম্ভগুলি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, আমাদের ওপর হওয়া নিষ্ঠুরতা ও অপমানের কথা আমরা যেন ভুলে না যাই, তার বার্তা দিচ্ছিল। সেদিন সকালে আমি যখন মন্দিরের পবিত্র সভামণ্ডপের দিকে অগ্রসর হলাম, তখন মন্দিরের ভগ্ন স্তম্ভগুলি এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরগুলি দেখে আমার মনের মধ্যে অপমানের যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।'

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল একটি জাগতিক প্রতীক নয়। সামাজিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের মধ্যে প্রোথিত এটি এমন একটি সূত্র যা সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে, উৎসাহিত করতে শক্তি প্রদান করে থাকে। কে এম মুনশী আরও লিখেছেন, ' ১৯৪৭ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সরদার প্যাটেল প্রভাস পাটনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সোমনাথের ভগ্নদশা দর্শন করেন। সেখানে এক প্রকাশ্য সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, আগামী নতুন বছরের শুভক্ষণে আমাদের সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ করতে হবে। এই পবিত্র কাজে গুজরাটের সমস্ত মানুষকে অংশগ্রহণ করতে হবে।''.... কিছু লোক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষগুলিকে স্মৃতিচিহ্ন রূপে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দিয়েছিলন, তাদের কাছে মৃত পাথরগুলিকেই বেশি জীবন্ত মনে হতে পারে কিন্তু আমি নিশ্চিভাবে মনে করি যে সোমনাথ কোনো প্রাচীন স্মৃতি স্মারক নয়, বরং প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে এক জাগ্রত মন্দির এবং এটি পুনর্নির্মাণের জন্য সমগ্র জাতি দায়বদ্ধ।'

রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলিতেও মতপার্থক্য

সেই সময়ে আমাদের জাতীয় নেতারা দুটি ভিন্ন মতাদর্শে বিভক্ত ছিলেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বের বিষয়গুলিতে অনেকবার ভিন্ন রাজনৈতিক মত ও পক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ, রাষ্ট্র ও সমাজের বিষয়ে রাজনীতির আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে। সোমনাথের বিষয়ে নেহরুর যে দৃষ্টিভঙ্গি, অযোধ্যা বিষয়ে বিরোধিতাও সেই মানসিকতারই প্রতিফলন ছিল। কে এম মুনশী লিখেছেন, 'ক্যাবিনেট বৈঠকের শেষে জওহরলাল আমাকে ফোন করে বলেছিলেন সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণে আপনার প্রচেষ্টা আমার পছন্দ নয়। এটি হিন্দু পুনরুত্থানবাদ।'' আমি জবাব দিয়েছিলাম, আমি বাড়িতে গিয়ে যা কিছু ঘটেছে তার জবাব দেব।'

বিষয় হলো, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণকে হিন্দু পুনরুত্থানের কাজ বলে কেন বিরোধিতা করেছিলেন এবং কে এম মুনশী একে 'ভারতের সম্মিলিত বিবেক' বলে দেশবাসীকে কেন আনন্দের সংকেত দিয়েছিলেন? একই বিষয়ে দুটি বিরোধী দৃষ্টিকোণ কেন দেখা দেয়? বস্তুত, এসব ভারতের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি। পণ্ডিত নেহরু ভারতবিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ভারত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইউরোপীয় মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা সম্পূর্ণ অভারতীয়। অন্যদিকে সরদার প্যাটেল, কে এম মুনশী, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভারতীয় সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। যা ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে মূল বিষয়কে মূর্ত করে তুলেছিল। গান্ধীজীও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি মনে করতেন বহিরাগত আক্রমণকারীদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের পুনর্নির্মাণ হওয়া প্রয়োজন কিন্তু তা জনসাধারণের অনুদানের অর্থেই করা হবে। কে এম মুনশী লিখেছেন, '১৯৫১ সালের ২৪ এপ্রিল আমি যে পত্র তাঁকে (মিঃ নেহরু) লিখেছিলাম তা আমি হুবহু পুনরায় লিখছি— 'যখন সরদার বাপু (গান্ধীজী)-র সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করেন তখন তিনি বলেছিলেন, এটা একেবারে ঠিক যদি মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জনসাধারণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। গ্যাডগিলও বাপুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং বাপু তাঁকে একই পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরপর মন্দির পুনর্নির্মাণে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তার বিষয়ে আলোচনা থেমে যায়।

'...সোমনাথ বিষয়ে আপনি মন্ত্রীসভায় আমার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আমি

খুশি যে আপনি তা করেছেন। কারণ আমি আমার কোনো চিন্তাভাবনা বা কাজ গোপন করতে চাইনি, বিশেষ করে আপনাদের কাছ থেকে, যাঁরা গত কয়েক মাস ধরে আমার ওপরে এত বিশ্বাস রেখেছেন। আমি অনেক প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণে সহায়তা করেছি।' '...এরকম কোনো কাজে সহায়তা প্রদান করার সময় আমার উকিল হওয়া বা একজন সাধারণ নাগরিক বা একজন মন্ত্রী হওয়া একেবারেই কাকতালীয়। আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে, আমার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি আধুনিক ভারতকে গুজরাটের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে। আমার 'জয় সোমনাথ' উপন্যাস সারা দেশে জনপ্রিয়। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, ভারতের 'জাগ্রত জনতা' অন্য কোনো কাজের তুলনায় সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণে ভারত সরকারের সহযোগিতার কথা শুনে খুব খুশি।'

'... গতকাল আপনি 'হিন্দু পুনরুত্থান' সম্পর্কে বলেছিলেন। আমি আপনার চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানি। সবসময় আমি তার সম্মান করি। আশাকরি আপনি আমার ভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন। আমি আমার সাহিত্য ও সামাজিক কাজের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের কিছু সমালোচনা করেছি এবং সেগুলির নতুন রূপ বা পরিবর্তন করার বিনম্র আবেদন করেছি এই বিশ্বাসে যে, এই ছোট্টো পদক্ষেপই আধুনিক পরিদৃশ্যে ভারতকে এক উন্নত ও সশক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে।'

'...আরও একটি কথা যোগ করতে চাই, অতীতের প্রতি আমার বিশ্বাস আমাকে বর্তমানে কাজ করতে এবং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে শক্তি প্রদান করে চলেছে। আমার কাছে এই ধরনের স্বাধীনতার কোনো মূল্যই নেই যা আমাদের ভগবদ্গীতা থেকে বঞ্চিত করে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে মন্দিরের প্রতি প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধাকে উপড়ে ফেলে এবং আমাদের জীবনের ভিত্তিকে নষ্ট করে দেয়। আমাকে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিশেষাধিকার দেওয়া হয়েছে। এতে আমার অনুভব হচ্ছে এবং আমার পুরো বিশ্বাসও রয়েছে যে, যখন এই মন্দির আমাদের জীবনে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন মানুষের মনে ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা এবং আমাদের শক্তির একটি পরিষ্কার ধারণা পাবে। যা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর স্বাধীনতার মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।'

আমার এই পত্র পড়ার পর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রী ভি পি মেনন আমাকে নিম্নলিখিত উত্তর পাঠান, ''আমি আপনার প্রেরিত সুন্দর পত্রটি পড়েছি। আমি সম্ভবত সেই ব্যক্তি যে আপনার পত্রে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি পূরণ করতে বা প্রয়োজন হলে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।''

তিনি লিখেছেন, ''সোমনাথের প্রাণপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে আর একটি বিষয় জড়িত ছিল। যখন প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় এল, আমি রাজেন্দ্র প্রসাদের (তৎকালীন রাষ্ট্রপতি) সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করার অনুরোধ করি। আমি তাঁকে এটাও বলেছিলাম যে, তিনি যদি আমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন তাহলে আসতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার পত্র বিনিময়ের বিষয়টি তাঁর কাছে গোপন ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, প্রধামন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি যাই-ই হোক, তিনি আসবেন আর প্রাণপ্রতিষ্ঠাও করবেন। বলেছিলেন, আমাকে নিমন্ত্রণ করা হলে আমি মসজিদ বা গির্জার ক্ষেত্রেও একই কাজ করতাম।

আমার আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হলো। যেই ঘোষণা করা হলো যে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করতে আসছেন, তখনই জওহরলাল তাঁকে না যেতে ভীষণ চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন। মন্দির উদ্ঘাটনের সময় তাঁর ভাষণ সমস্ত খবরের কাগজে প্রকাশ করেছিল কিন্তু সরকারি রেকর্ড থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।''

এটা আশ্চর্যের কথা যে, দেশে উদারতা ও বাকস্বাধীনতার প্রতীক বলে জাহির করা নেহরু মহামহিম রাষ্ট্রপতির ভাষণ সরকারি রেকর্ড থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সেই সময় নেহরুর সঙ্গে এরকম অনেক লোক ছিলেন যারা সোমনাথ মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী-সহ জাতীয় স্তরের বহু নেতা মন্দির পুর্নির্মাণের পক্ষে ছিলেন। তারই পরিণামস্বরূপ এখন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন সুন্দর ও বিস্ময়কর মন্দিরটি দর্শন করতে পারছেন।

৬০ বছর ধরে একটি দলেরই নিরবচ্ছিন্ন শাসনের কারণে দেশের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে এরকম একটি অভারতীয় প্রতিহিংসার রাজনীতির আমদানি হয়েছে। এজন্যই অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় নেহরু মানসিকতার মানুষেরাই সারা দেশে বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। কিন্তু কোটি কোটি ভারতবাসীর মনে যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি প্রেম প্রবাহিত রয়েছে, তার কারণেই সকল বিরোধিতার অবসান হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এটাই ভারতের জাগ্রত জনতার বিবেক। এই অন্তঃচেতনাই সরদার প্যাটেল, কে এম মুনশী, মহাত্মা গান্ধী, ডঃ রাধাকৃষ্ণন, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যদের মতো মানুষের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে এবং আজকের ভারতের রাষ্ট্রভক্ত নেতাদের কথায় ও কাজে তা প্রতিফলিত হয়ে চলেছে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

শোক সংবাদ

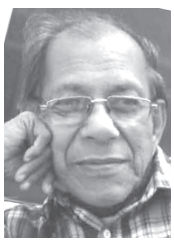

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা পুরাতন বিবেকানন্দ ভাগের স্বয়ংসেবক সুকুমার সেন গত ২ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ১৯৮৯ সাল থেকে তিনি সংস্কার ভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে সহ সভাপতি, সংগঠন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে উত্তর কলকাতার বাগুইআটিতে চলে যান। বর্তমানে কন্যার কাছে থাকতেন।

শিল্পোন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাকেন্দ্রের পরিবর্তন আশু প্রয়োজন

গত ১৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে একটি রাজনৈতিক সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সভার পর অনেকের মনেই প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী কেন বললেন না সিঙ্গুরে টাটাকে ফিরিয়ে আনবেন? এদিন মোদীজী যা বললেন, তার অনেকটাই হয়তো সাধারণ মানুষ ঠিক ধরতে পারেননি। কারণ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একমাত্র রাজ্য যা গত ৫০ বছর ধরে নেহরুভিয়ান মিশ্র অর্থনীতির বাইরে বেরিয়ে আসেনি বা বেরিয়ে আসতে পারেনি। রাজ্যের বহু মানুষের সামনে পাটকল বা কাগজ কলের বাইরে কর্মসংস্থানের অন্য কোনো বিকল্পও নেই। এই জনসভায় মোদীজী পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে ক'টি বড়ো ঘোষণা করেন তার মধ্যে দু'টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা। প্রথমটি হলো, একটি মাল্টিমোডাল লজিস্টিক্স হাব এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, মৎস্য ব্যবসা।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে যে লজিস্টিক্স হাব বা ট্রেডিং হাবের কথা বলেছেন সেটা আসলে কী? এর অর্থ হলো একযোগে— নদী/সমুদ্র বন্দর, রেলপথ, সড়কপথ, জলপথ, কোল্ড স্টোরেজ, অটো হাব, বিমানবন্দর, মেট্রো রেল, ফ্রেট করিডোর, ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, আইটি (তথ্য-প্রযুক্তি), ইলেক্ট্রনিক্স শিল্প ইত্যাদি। সংক্ষেপে, সব গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের সম্মিলিত নেটওয়ার্ক-সম্পন্ন, কলকাতার বিকল্প একটি নতুন নগরী, কিংবা তার থেকেও বড়ো কিছু, যেখানে আসতে পারে কয়েক লক্ষ কোটির বেশি বিনিয়োগ। টাকার অঙ্কে তা হলো টাটার কারখানায় প্রস্তাবিত লগ্নির বহুগুণ। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে পারে প্রচুর ব্যবসা, তৈরি হতে পারে অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ। এটা ঠিক যে এই বিপুল শিল্প সম্ভাবনার বিষয়টি সভামঞ্চ থেকেই একটু বিশদে আলোচনা করা যেত। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, হংকং, সিঙ্গাপুর, টোকিয়ো এবং মুম্বই হলো বর্তমান বিশ্বে লজিস্টিক্স হাব। একটি লজিস্টিক্স হাব হলো একটা গাড়ি কারখানার ১০০ গুণ। নিউ ইয়র্ক ও টোকিয়োর জিডিপি পৃথিবীর দুই বৃহত্তম দেশ রাশিয়া ও কানাডার চেয়ে বেশি। এই দলে পশ্চিমবঙ্গ গেলে অসুবিধা কোথায়?

এবার আসা যাক মৎস্য ব্যবসার প্রসঙ্গে। আজ থেকে ১০০-২০০ বছর আগে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল কলকাতা। তখন বাঙ্গালি ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রানি রাসমণি ও হেমচন্দ্র নস্কর। কলকাতা জুড়ে এখন বিভিন্ন ব্যবসাবাণিজ্য মুসলমানদের দখলে। মৎস্য ব্যবসা মানে শুধু মাছ ধরা ও বিক্রি করা নয়। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পুরো একটি সাপ্লাই চেইন, যেখানে রয়েছে মাছ ধরার জাল, মাছের হরমোন, মাছের ওষুধ, জেনেটিক্স, বরফ, কোল্ড স্টোরেজ, লজিস্টিক্স, রিটেল ও রপ্তানি ব্যবসা। বাঙ্গালি চিরকালই মৎস্যপ্রেমী একটি জাতি। পশ্চিমবঙ্গে এটি হতে পারে কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা, যেখানে কাজ পেতে পারে এক কোটিরও বেশি লোক। অথচ আজ পশ্চিমবঙ্গে রুই মাছ আসে অন্ধ্র থেকে, কাতলা মাছ আসে বিলাসপুর থেকে, ইলিশ আগে আসত বাংলাদেশ থেকে এবং এখন আসে গুজরাট, মহারাষ্ট্র (মুম্বই) থেকে। মৎস্য চাষ ও মৎস্য ব্যবসায় কেন্দ্র বহু টাকা ভরতুকি দেয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যচাষিরা সেসব কিছু থেকে বঞ্চিত থাকে।

প্রশ্ন হলো, টাটারা কি ন্যানো গাড়ির প্রকল্প গড়তে পশ্চিমবঙ্গে আবার আসবে? উত্তর হলো, রাজ্যের ক্ষমতা কেন্দ্রে পরিবর্তন হলে টাটা গোষ্ঠী যদি রাজ্যে আসে, তবে অন্য কোনো গাড়ি বা অন্য কেনো শিল্প তারা এই রাজ্যে স্থাপন করতে পারে। কিন্তু 'ন্যানো' নয়। কারণ ইতিমধ্যেই ভারতের অন্যত্র এর একটি কারখানা রয়েছে এবং ২০০৬-এর পর বিগত ২০ বছরে অটোমোবাইল শিল্পের বাজারের চাহিদা ও জোগানের খেলা পালটেছে। আগামীদিনে টাটা হয়তো ইলেক্ট্রিক ভেহিকল্ (ইভি) বানাতে পারে। অন্যান্য শিল্পগোষ্ঠীরও পশ্চিমবঙ্গে আসার সুযোগ রয়েছে। বিমান, জাহাজ, ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং ইত্যাদি বহু শিল্প এই রাজ্যে স্থাপিত হতে পারে। সাম্প্রতিক কালে ইজরায়েল, জার্মানি, রাশিয়া ভারতে অস্ত্র তৈরির কারখানা খুলতে চায়। এদেশে তারা শুরু করতে চায় মহাকাশ গবেষণা প্রকল্প। আগামীদিনে এই প্রকল্পগুলির গন্তব্যস্থল হয়ে উঠতে পারে 'পশ্চিমবঙ্গ'। তাহলে একটি জনসভায় মোদীজী কেন শুধুমাত্র টাটার নাম নেবেন? উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্ব- প্রতিষ্ঠিত, গরিব পরিবার থেকে উঠে আসা মানুষ। তাঁর কাছে একটা বখাটে মার্কা প্রতিশ্রুতির বায়নাটা শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে বড্ড বেমানান। তিনি কি হাওয়ায় একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়ে আগামীদিনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফয়দা নিতে পারেন?

১৯৫১ সালে 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতার ৫১ বছর পর কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে ভারতীয় জনতা পার্টি। ইন্দিরা গান্ধীর মিথ্যা 'গরিবি হটাও' প্রতিশ্রুতির বিপ্রতীপে মূল্যবোধের রাজনীতিকে হাতিয়ার করে মাত্র দু'টি আসনে জিতে লোকসভায় এসে বহুবার ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে নানা আওয়াজ শুনেছেন অটলজীরা। তবু তাঁরা কোনোদিনই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেননি। ইতিহাস সাক্ষী যে, তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে মাত্র ৬ বছরে দেশবাসীর জীবনযাত্রার কতটা মানোন্নয়ন ঘটে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ভারতের প্রায় ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তার মধ্যে এই রাজ্যেরও অনেকেই রয়েছেন। দেশের এক বিস্তীর্ণ অংশকে যদি পালটে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে বিজেপি; উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরার ভাগ্য যদি পরিবর্তিত হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গকেও উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবে এই রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক শক্তি। কিন্তু মিথ্যা, ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিজেপির কাজ নয়। সেই রাজনীতি করেননি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবাণী বা নরেন্দ্র মোদী। কাজই বিজেপির পরিচয়। গোটা দেশটা ঘুরে দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যে বাঙ্গালি ছেলে-মেয়েরা অন্য রাজ্যে চাকরি করছে, তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেও সবকিছুই জানা যাবে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে ভোট নেবে না ভারতীয় জনতা পার্টি। 'লজিস্টিক্স হাব' কথাটার অর্থ সারা দেশের অনেকেই জানেন। কিন্তু গত ৫০ বছর পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো উন্নতি হয়নি সেটা হয়তো ঠিকঠাক অনুধাবন করেননি রাজ্যবাসী। □

দেশের স্বার্থেই সংবিধানের কিছু কিছু ধারা পরিবর্তন করা উচিত

ডাঃ মধুসূদন পাল

খণ্ডিত ভারতের হাতে ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যরাত্রে। সেই সময় থেকে ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০, নতুন সংবিধান কার্যকরী হওয়া পর্যন্ত খণ্ডিত ভারত শাসিত হয়েছে ১৯৩৫-এর ব্রিটিশ শাসন আইন এবং ১৯৩৭-এর ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস অ্যাক্ট অনুযায়ী। এগুলো তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। ক্ষমতা হস্তান্তর থেকে নতুন সংবিধান চালু করার মধ্যবর্তী সময়ে কাজ করার জন্য তৈরি হয়েছিল কেন্দ্রীয় পরিষদ বা সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্লি যা কার্যত পরিণত হয়েছিল গণপরিষদে। এর সভাপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সদস্যদের একটা অংশ পরবর্তীকালে পাকিস্তানে চলে গেলেও তারা Constituent Assembly-র আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন সক্রিয়ভাবে। গণপরিষদ তৈরি হয় ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৫। গণপরিষদ ড. বি.আর. আম্বেদকরকে সংবিধান খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে। দুর্ভাগ্য এই, ১৯৩৫-এ ব্রিটিশ ভারত শাসন আইনকে ভিত্তি হিসেবে রেখে তথাকথিত একটা স্বাধীন দেশের সংবিধান তৈরির কাজে নেমেছিলেন তথাকথিত বড়ো বড়ো দেশনায়ক, পণ্ডিতরা! এতো জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা, মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া। হ্যাঁ, কার্যত সেদিন তাই-ই হয়েছিল।

২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন আলোচনা করে পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান রচনা করা হয়। গৃহীত হয় ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯। কার্যকরী হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০। এই দিনই গভর্নর জেনারেলদের দ্বারা ভারত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে দু'জন গভর্নর জেনারেলের একজন ভারতবর্ষ খণ্ডিত করার প্রধান খলনায়ক মাউন্টব্যাটেন এবং অন্যজন এদেশীয় রাজা গোপালাচারিয়া। দু'জনেই শপথ নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা-রানির নামে। অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ পর্যন্ত খণ্ডিত ভারতের অবস্থান ছিল ডোমিনিয়ন স্টেট হিসেবে; পূর্ণ স্বাধীন দেশ হিসেবে নয়। অবশ্য, এইসব চূড়ান্ত অপমানজনক শর্ত মেনেই ক্ষমতা হস্তান্তর গদগদভাবে মেনে নিয়েছিলেন নেহরু-গান্ধী এবং তাদের অনুগামীরা। এবার প্রশ্ন, স্বাধীনদেশের সংবিধানের মূল ভিত্তি হিসেবে কেন রাখা হয়েছিল ১৯৩৫-এর ব্রিটিশ ভারত আইন? জনগণের স্বার্থে, না অন্য কারুর স্বার্থে?

অনেকের বক্তব্য, সাধারণ জনগণের স্বার্থে ভারতীয় সংবিধান নয়। তাদের অভিমত, এই সংবিধান ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন, জীবিকা, সম্পদ ও সম্মানের নিশ্চয়তা না দিতে পারলেও নিশ্চিত করেছে এত শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক, শিল্পপতি, ব্যবসাদার, আড়তদার, বিচারক, সরকারি কর্মচারী প্রমুখের সীমাহীন কালো টাকা। তাদের আরও বক্তব্য, এই সংবিধানের জন্যই জন্ম হচ্ছে দুষ্ট শাসক। আইন, নিয়ম, অনুসন্ধান ও বিচারের নামে চলছে প্রহসন-নাটক। তাদের অভিনয় গুণে ভারতের জনগণ দশকের পর দশক ধরে বিশ্বাস করেছে দেশের শাসন ব্যবস্থার কর্মতৎপরতা হিসেবে। প্রতিবারেই ধান্দাবাজরা সুপরিকল্পিতভাবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত আইনের ফাঁস গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। সমালোচনা করলেই নেতা-মন্ত্রীরা বলছেন 'আইন আইনের পথে চলছে।।'

সংবিধান প্রণেতাদের আশাকে মান্যতা দিয়ে ইউনিফায়েড সিভিল কোড, গোহত্যা নিবারণের মতো সংবেদনশীল বিষয় কার্যকরী করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান পরিবর্তনের বিল নিয়ে আসে সংসদে তখন এরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধা দেয়। সেজন্যই দেশের স্বার্থেই দেরিতে হলেও সংবিধান পরিবর্তন করতেই হবে।

ড. আম্বেদকর সাহেবকে ব্রিটিশ-গান্ধী-নেহরুরা ব্যবহার করেছিলেন ভারতের সংবিধান রচনা করার জন্য। আম্বেদকর সাহেব একদিনও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেননি। তিনি ভাগ্যবান। কারণ, তিনি ভারতের সংবিধান রচনার জনক রূপে পূজিত। আম্বেদকর সাহেবও সুখে ছিলেন না। কারণ, সত্য কথা অথবা দেশের মঙ্গলের কথা বললে তাঁর উপর নেমে আসত নেহরুর অপমান। জীবনের শেষপ্রান্তে নেহরুর দেওয়া আঘাত আর হজম করতে পারেননি। ততদিনে নেহরুদের আসল মূর্তি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিবেকের তাড়নায় বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "People always keep on saying to me 'Oh, you are the maker of constitution'. My answer is I was a hack. What I was asked to do, I did much aganist my will... Sir, my friends tell me that I have made the constitution. But I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. I do not want it. It does not suit anybody..." (Ambedkar, Rajya Sabha speech, 2nd September,

ফঃ ২

1953)

অর্থাৎ জনগণ সবসময় আমাকে বলে 'আপনি তো সংবিধান রচয়িতা?' আমি বলি, আমি হলাম ওদের ভাড়া করা লেখক বা বলবে তাই লিখব। আমাকে বলে 'আপনি তো সংবিধান রচয়িতা?' আমি বলি, আমি হলাম ওদের ভাড়া করা লেখক যা বলবে তাই লিখব। আমাকে যা দুষ্কর্ম করতে বলা হয়েছিল তাই করেছি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে... মহাশয় বন্ধুরা বলে, আমি সংবিধান সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আমি বলতে প্রস্তুত যে, আমি এই সংবিধান পুড়িয়ে ফেলার জন্য প্রথম ব্যক্তি হব। আমি এই সংবিধান চাই না। এতে কারও উপকার হবে না। ...বলতে বাধা নেই, আম্বেদকর যথেষ্ট পণ্ডিত ও সৎ ছিলেন ব্যক্তিজীবনে।

ভারতের সংবিধানের মূল ব্যাখ্যাকার দেশের সুপ্রিম কোর্ট। ধারা ৩৬৮-তে সংবিধান পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে পার্লামেন্টকে। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ১০৬ বার সংবিধান পরিবর্তন করা হয়েছে। এর অধিকাংশই হয়েছে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে। আরও ভয়ংকর হলো রাজনারায়ণের কাছে এলাহাবাদ হাইকোর্টে, ইলেকশন পিটিশন মামলায় ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হবার পরে, নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তিনি দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা (এমার্জেন্সি) ঘোষণা করেন। সংবিধান, গণমাধ্যম, আদালত সবার টুঁটি চেপে ধরেছিল জরুরি অবস্থা। লক্ষ লক্ষ বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে বিনাবিচারে বন্দি রাখা হয়েছিল দিনের পর দিন। প্রায় বন্ধ ছিল পার্লামেন্ট। এই সুযোগে ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধন পাশ করা হয়েছিল, যেটাকে বলা হয় 'মিনি কনস্টিটিউশন'। এটা কার্যকরী হয়েছে ৩ জানুয়ারি ১৯৭৭ সাল থেকে। এই সংশোধনীতে সংবিধানের মুখবন্ধে যোগ করা হয়েছে দু'টি নতুন শব্দ— 'সেকুলার' ও সোশ্যালিস্ট'। ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এই দু'টি শব্দ যোগ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। স্বয়ং আম্বেদকরেরও এই 'সেকুলার' শব্দ ব্যবহারে প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। তাঁর মত ছিল, ভারত যুগ-যুগান্তর ধরে স্বাভাবিকভাবেই সর্বপন্থ নিরপেক্ষ। যুগে যুগে সে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের আশ্রয় দিয়েছে। ভারতের মূল সুর নিজস্ব দর্শন, বহুত্ববাদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। তাই, এখানে বিভিন্ন মতামতের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করছে যুগ যুগ ধরে। সুতরাং সংবিধানে 'সেকুলার' শব্দ ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়।

আসলে, ভণ্ড রাজনীতিকদের ব্যক্তিস্বার্থে 'সেকুলার' শব্দ সংযোজন করা হয়েছিল পেশীশক্তির জোরে— পার্লামেন্টে কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই। এটা এখন স্পষ্ট যে, জোরপূর্বক সংবিধান পরিবর্তনের উদ্দেশ্যই ছিল, ভারতের সনাতনীদের অধিকার খর্ব করা এবং মুসলমান ও খ্রিস্টানদের শক্তি বৃদ্ধি করা। বাস্তবে তাই হয়েছে। ভারতের লক্ষ লক্ষ মসজিদ ও গির্জায় ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আইন প্রায় চলে না; কিন্তু সনাতনীদের মন্দিরের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ তীব্রতর হচ্ছে তো হচ্ছেই। এভাবেই সংবিধানকে হাতিয়ার করে ভারতকে ধীরে ধীরে ইসলামি দেশে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে সুকৌশলে। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের এ ব্যাপারে রয়েছে প্রধান ভূমিকা। এদের 'নোংরামি' বা 'অসভ্যতা'র শেষ নেই। যেমন, সংবিধানের খসড়া কপিতে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অলংকরণ করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র, কুরুক্ষেত্র, নেতাজী, INA প্রভৃতি চিত্র। সংবিধান মুদ্রণের সময় এসব চিত্র বাতিল করে দেওয়া হয় নেহরুর সময়ে। অর্থাৎ ভারতাত্মা ধ্বংসের নায়ক দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। উল্লেখ্য, খসড়া কপি ইংরেজিতে লিখেছিলেন প্রেমবিহারী নারায়ণ। তাঁর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মতো। মুদ্রণের সময় সবই বাদ পড়ে।

আমরা দেখছি, দুর্নীতিগ্রস্ত, ধড়িবাজ রাজনীতিক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দেশবিরোধী কাজ অব্যাহত রাখার জন্য তাদের হয়ে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে দাঁড়াচ্ছেন নামি-দামি উকিল-ব্যারিস্টার। আইনের নানান ফাঁক দিয়ে তারা এসব অভিযুক্তদের মুক্ত করে আনছেন। সাধারণভাবে এ জাতীয় মামলা চলে ৩০-৪০-৫০ বছর ধরে। অনেকের বিশ্বাস, এইসব অপকর্মের পিছনে আছে দেশের সংবিধানের ফাঁকফোঁকর এবং এক শ্রেণীর অসৎ বিচারক। কী করে এরা বিচারক হন--- সমাধানহীন প্রশ্ন। আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা এবং একশ্রেণীর বিচারকের রায়দান দেখে মনে হয়— বিচার দেরি হওয়া কিংবা অপরাধীর পক্ষে রায়— বিচার না হওয়ার সমান। এসব পরিবর্তন করতে গেলে সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন। এক প্রখর রাষ্ট্রবাদী সরকার বা সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া মানুষের স্বার্থে সংবিধান সংশোধন সম্ভব নয়।

সংবিধানের মূল সুর, আইনের চোখে সবাই সমান। তাহলে ইউনিফায়েড সিভিল কোড আইন আনতে বামপন্থী, সেকুলারপন্থী আর কংগ্রেসিদের আপত্তি কোথায়? কারণ, তারা মুখে সাম্যের কথা বললেও মনে মনে চায়, জাতপাতের ভিত্তিতে ভাগ করে দেশটাকে শাসন-শোষণ করতে। এদের দ্বিচারিতার জন্যই ইউনিফায়েড সিভিল কোড চালু করা যায়নি। একইভাবে গোহত্যা নিবারণ— ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে লেখা থাকলেও তা ছাপার অক্ষরেই থেকে গেছে। কারণ, এক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থরক্ষার কারণে একেও কার্যকরী করা যায়নি। সেকুলারপন্থী বুদ্ধিজীবী, কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসিরা দাবি করে, তারা ভারতীয় সংবিধানকে মান্যতা দেয়। যদিও এরা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এ জাতীয় ইতিবাচক পদক্ষেপে প্রতিমুহূর্তে বাধা দিয়ে চলেছে। ছ'দশকের বেশি নেহরু-গান্ধী পরিবার দেশ শাসন করেছে। অসংখ্যবার তারা সংবিধান সংশোধন করেছে নিজেদের পরিবার, দলের স্বার্থে— জাতীয় স্বার্থে নয়। তাই সংবিধান প্রণেতাদের আশাকে মান্যতা দিয়ে ইউনিফায়েড সিভিল কোড, গোহত্যা নিবারণের মতো সংবেদনশীল বিষয় কার্যকরী করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান পরিবর্তনের বিল নিয়ে আসে সংসদে তখন এরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধা দেয়। সেজন্যই দেশের স্বার্থেই দেরিতে হলেও সংবিধান পরিবর্তন করতেই হবে। □

ভারতীয় সংবিধানের অর্থ উপলব্ধি আজ সময়ের দাবি

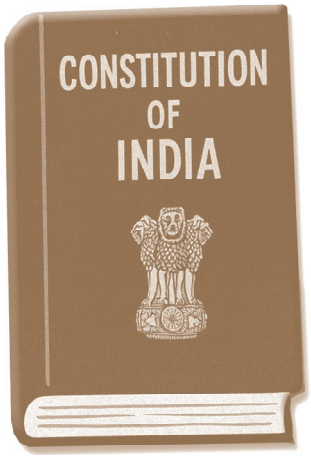

দেবাশিস লাহিড়ী

ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের শান্তি ও উন্নতি (peace and prosperity) বিধান। প্রধানত এই দু'টি বিষয়কে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই প্রণীত হয় ভারতীয় সংবিধান। গত দশ বছরে আমাদের দেশের ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে আনা গিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হলো ভারত। দেশের ভিতরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটাই সম্ভব হয়েছে। ২০১৪ সালের পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় দেশজুড়ে অহরহ সন্ত্রাসবাদী হামলা বর্তমানে হয় না বললেই চলে। বিদেশি আক্রমণ থেকে শুরু করে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী মদতেরও যোগ্য জবাব দেওয়া হচ্ছে। সামরিক প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে। জেহাদি ও মাওবাদী সন্ত্রাস আজকে দেশজুড়ে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ।

কাজটা যে খুব সহজে হয়েছে, তা কিন্তু নয়। এক্ষেত্রে দেশকে সুরক্ষিত রাখার একটি মূলমন্ত্র রয়েছে। দেশের ২০ শতাংশ মানুষ, অর্থাৎ প্রায় ২০ কোটি লোকের সবাইকে সন্দেহভাজন হিসেবে ধরতে হবে। কারণ তাদের মধ্যে থেকেই যে কোনো মুহূর্তে উদয় হতে পারে কোনো জেহাদির। এই ২০ শতাংশ লোকের মধ্যে যত বড়োই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কেউ হোন না কেন— সন্দেহের ঊর্ধ্বে এরা কেউই নন। স্বনামধন্য সাংবাদিক অরুণ শৌরী তাঁর রচিত একটি বইতে এই বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সঙ্গে আপোশ আর কোনোভাবেই করা হবে না। গত দশ বছরে এহেন কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে ভারত সরকার। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও ঠিক এই পদ্ধতিতেই ইসলামিক জেহাদের মোকাবিলা করছে। শাহরুখ খানকে তিন ঘণ্টা এয়ারপোর্টে বসিয়ে রেখে অথবা পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এপিজে আবদুল কালামকে জুতো খুলতে বাধ্য করে বার বার এই ব্যাপারে তাদের কঠোর নীতি প্রকাশ্যে এনেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির বাংলা দৈনিক পত্রিকাগুলি যতই লিখুক না কেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং আজকের ভারত। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তপোক্ত রাখার বিষয়টি ভারতের মতো ১৪০ কোটি জনসংখ্যা-সম্পন্ন বিশাল দেশে রীতিমতো ব্যয়বহুল। সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য প্রতি বছর প্রয়োজন বিপুল ব্যয়বরাদ্দ, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যা পারদর্শিতার সঙ্গে করে চলেছে। এছাড়া, কোভিড-পরবর্তী পর্যায়ে দেশের প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করে চলেছে কেন্দ্র।

অনেকের ধারণা এখন ভারতের পরিবেশ-পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিরাজ করছে শান্তিশৃঙ্খলার পরিবেশ। সম্প্রতি ভারতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই মন্তব্য করেছেন যে, এখন জমানা বদলে গিয়েছে। অর্থাৎ বিচারবিভাগও এই সদর্থক প্রভাবের বাইরে নয়। কারণ বিচারকরাও মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত।

ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ, ধারা ও উপধারা প্রণীত হয়েছে দেশে শান্তির পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যেই। ঘরে-বাইরে এই শান্তি বজায় রাখতে দরকারে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়কে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। দেশজুড়ে ঘটে চলা নানা ঘটনায় সেই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে অনুভূত হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি কাটাছেঁড়া করার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে পরের বছর ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর নামে ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ (Preamble) পরিবর্তন। এই সংশোধনীর আড়ালে ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে 'পন্থনিরপেক্ষ' (secular), 'সমাজতান্ত্রিক' (socialist) শব্দ ঢুকিয়েছে। ১৯৪৯ সালের

১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে পরের বছর ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর নামে ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ (Preamble) পরিবর্তন। এই সংশোধনীর আড়ালে ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে 'পন্থনিরপেক্ষ' (secular), 'সমাজতান্ত্রিক' (socialist) শব্দ ঢুকিয়েছে।

২৬ নভেম্বর সংবিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীন ভারতের যে সংবিধান প্রণীত হয়, সেখানে কিন্তু এ জাতীয় কথাবার্তা উল্লেখিত হয়নি। দেশের বর্তমান প্রজন্ম এই বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞাত। ১৯৭৬ সালের সংবিধানের মুখবন্ধ পরিবর্তিত হলেও এখনও ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে জ্বলজ্বল করছে একটি লেখা

যে, '১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে এই সংবিধান গৃহীত হয়েছিল'। অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান বলবৎ হওয়ার ২৬ বছর পর সংবিধানের মুখবন্ধে সাল-তারিখ অপরিবর্তিত রেখে এই শব্দগুলির বলপূর্বক অন্তর্ভুক্তি একটি হাস্যকর ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সম্বন্ধে ড. সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর করা মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে এখনও বিচারাধীন।

ভারতের সংবিধান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান, যা সবচেয়ে বেশি বার সংশোধিত হয়েছে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি কয়েক বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন দেশের সংবিধান অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন সংবিধান পর্যালোচনা করে তার বিভিন্ন নির্যাস তাঁরা গ্রহণ করেন এবং সেই বিষয়গুলি ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত 'মৌলিক অধিকার'-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলির ধারণা গৃহীত হয়েছে জাপানের সংবিধান থেকে। আয়ারল্যান্ডের সংবিধান থেকে গৃহীত হয়েছে 'ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপল্‌স্ অফ স্টেট পলিসি' বা শাসনযন্ত্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতির ধারণা। বিভিন্ন বিষয়ে বার বার পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর যখন সংবিধান পাশ হবে, তখন কে এম মুন্সী বললেন যে, ভারতবর্ষ তাঁর গ্রামে বসবাস করে। এতবড়ো দেশের ভিত্তি যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, সেই সম্পর্কে তো সংবিধানে কোনো কিছুরই উল্লেখ নেই। তখন ঠিক হয় ২৪৩ নং অনুচ্ছেদে এর উল্লেখ করা হবে এবং পরে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি এই অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ব্রিটেনের সংবিধান হলো অলিখিত। সংবিধান বিশেষজ্ঞ এক পণ্ডিত ব্যক্তি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, পুরুষকে মহিলায় রূপান্তরিত করা বা একজন মহিলাকে পুরুষে পরিণত করা ছাড়া ব্রিটিশ সংবিধানের দ্বারা বাকি সবকিছুই সম্ভব। এই কথাটি হয়তো ভারতীয় সংবিধানের ক্ষেত্রেও কম-বেশি প্রযোজ্য। বিশেষত, ১৯৭৫ সালে দেশজুড়ে জারি হওয়া 'জরুরি অবস্থা' এই বিষয়টিকে ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে।

সেই সময় দেশের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলেছিল যে, পুলিশ যে কারুর প্রাণ নিতে পারে, কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে 'রাইট টু লাইফ' বা প্রাণে বেঁচে থাকার অধিকারের মতো মৌলিক অধিকার পর্যন্ত হরণ করে নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকদের সংবিধান-প্রদত্ত সমস্ত মৌলিক অধিকার ছিল স্তব্ধ ও স্থগিত। পরে ১৯৭৭ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সরকার পরিবর্তিত হলে ৪৩ ও ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় সংবিধান সংশোধন করা হয়। ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর বিভিন্ন ধারা-উপধারা বাতিল করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতিতে আর কোনো ইন্দিরা গান্ধীর আবির্ভাব না হয়।

ইদানীং বলা হচ্ছে যে, ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত অধিকার বা ক্ষমতা অনুযায়ী অনির্দিষ্টকাল ধরে কোনো রাজ্যের পাঠানো বিলকে সম্মতি প্রদানে অস্বীকৃত হতে পারেন না সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল বা দেশের রাষ্ট্রপতি। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সংসদে পাশ হয় 'ইন্ডিয়ান পোস্ট অফিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৬'। প্রস্তাবিত আইনটির মাধ্যমে যেকোনো চিঠিপত্র খোলার বা যেকোনো মেইল ইন্টারসেপ্ট করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংহ বহুদিন তা আটকে রেখেছিলেন। সংসদে পাশ হওয়া সত্ত্বেও সেই বিলটিতে কিন্তু তিনি অনুমোদন দেননি। রাষ্ট্রপতি বিলটি গ্রহণ করে তাঁর পকেটে রেখেছিলেন, কিন্তু সম্মতি দেননি বলেই এই ঘটনাটি রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে 'পকেট ডিসেন্ট' বা 'পকেট ভেটো' হিসেবে সাম্প্রতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, সেই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে কোনোদিনই আইনে পরিণত হয়নি।

অর্থাৎ দেশের রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যের রাজ্যপালদের দেশের স্বার্থে কোনো বিলে অনুমোদন না দেওয়ার অধিকার দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান। বর্তমানে বিরোধী দল ও জোট শাসিত রাজ্যগুলি (তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ) হোস্টাইল স্টেট হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এই রাজ্যগুলির সরকারে ক্ষমতাসীন দলগুলির পক্ষ থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব। তাদের রাজ্যগুলিকে পৃথক দেশ হিসেবে দেখাতে চাইছে তারা। এই রাজ্যগুলিতে 'ভারতীয় সংবিধান' বলবৎ রয়েছে কিনা সেটাই ঠিকঠাক বোঝার উপায় নেই। এরা বিধানসভায় বিল এনে যা খুশি পাশ করাতে পারে। রাজ্যপাল সেই বিলে সম্মতি না দিলেই রে রে করে উঠবে। চাপে পড়ে, বিভ্রান্ত হয়ে সর্বোচ্চ আদালতও এদের পক্ষে অর্ডার ইস্যু করে দেবে। আবার পরিবেশ পালটালে সেই সর্বোচ্চ আদালতেরই সাংবিধানিক বেঞ্চ হয়তো বলবে যে, 'ঠিক হয়নি'। তাদের রায়ের মধ্যে অপরপক্ষের অনুকূলে কিছু বিষয়ের উল্লেখ করে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করবে। আর এসবই হবে সংবিধানের নামে। সংবিধানকে সামনে রেখেই এই বিষয়গুলি পরিচালিত হবে। আইনি পরিভাষায় বলা হয়, 'In every legal opinion, there is a scope of another opinion.'; কিন্তু সামাজিক পরিবেশের উন্নতি এবং সমাজ জাগরণই হলো আসল কথা যা দেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংবিধানের অর্থ হলো তার উদ্দেশ্য কার্যকর হওয়া। সাংবিধানিক উদ্দেশ্য কার্যকর হওয়ার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়ে থাকে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সুরক্ষা।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটি আজ রাষ্ট্রবাদী বিচারধারাকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিচ্ছে। গত ১৫ বছর ধরে জালিয়াতির মাধ্যমে রাজ্যের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা এই দলটির কীর্তিকলাপ একটু পর্যালোচনা করা যাক। বহরমপুর লোকসভা আসনে তাঁর কাজের জন্য হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে ভোট দিয়ে বার বার জয়যুক্ত করত অধীররঞ্জন চৌধুরীকে। তৃণমূলনেত্রী তো ইউসুফ পাঠানকে চিনতেন না। কী করে তিনি ইউসুফ পাঠানের সন্ধান পেলেন, কাদের মাধ্যমে সুদূর গুজরাট থেকে থেকে ইউসুফ পাঠানকে বহরমপুরে নিয়ে এসে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে দাঁড় করালেন সেই রহস্য এখনও অজানা। মুসলমান প্রার্থীর পক্ষে স্থানীয় মুসলমান ভোট এককাট্টা করে অধীরবাবুকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলে ভোটে হারালেন তৃণমূলনেত্রী। যারা ভারতীয় সংবিধানে 'সেকুলারিজম' শব্দ ঢুকিয়েছিলেন, এই ঘটনাটি হলো তাদের সেই সেকুলারিজমের নিদর্শন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বতন সভাপতি অশোক সিংঘলজী বলেছিলেন যে, মুসলমান ভোটব্যাংক বা ইসলামি সাম্প্রদায়িকতার জবাব একমাত্র হিন্দুদের একত্রীকরণের মাধ্যমেই দেওয়া সম্ভব। এটা আজ ভারতজুড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অনুভব করছে। এই হিন্দু সংগঠনের লক্ষ্যে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সমস্ত হিন্দুর একটি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'। ডাক্তারজী সত্যিই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন। সময় পরিবর্তিত হওয়ার দরুন সংবিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে প্রভূতভাবেই আদর্শ হয়েছে আজকের সামাজিক পরিস্থিতি। এটাই ৭৭তম ভারতীয় সাধারণতন্ত্র দিবসের সার্থকতা বলা যায়। ◻

স্বয়ংসেবকদের নাগরিক কর্তব্যই সংবিধানের মৌলিক কর্তব্য

শ্রীনিবাস

ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্থাপনা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতার ভাবনা থেকে সমাজকে পুনরুদ্ধার করার কাজে ব্রতী হয় সঙ্ঘ। সঙ্ঘ হিন্দুত্ব এবং ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের জন্য বদ্ধপরিকর। দেশ-সমাজকে সংগঠিত করতে নাগরিক কর্তব্য পালনে প্রথম থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ডাক্তারজী। সঙ্ঘের শাখায় আসা সকল স্বয়ংসেবককে রাষ্ট্র ও দেশমাতৃকার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সঙ্ঘ স্থাপনার দিন থেকেই সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে।

সঙ্ঘের এই ভাবনা পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যবোধের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সঙ্ঘের ভাবনাকে সংবিধান প্রণেতারা উপেক্ষা করতে পারেননি। কারণ সঙ্ঘ সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করে চলেছে। স্বর্ণসিংহ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭৬ সালে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় ৫১-ক ধারা। এই ধারায় বর্ণিত হয় 'ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ বা 'মৌলিক কর্তব্যপরায়ণতা'র বিষয়টি সঙ্ঘ কখনো কোনো মত বা প্রতিষ্ঠানকে বিরোধিতা করে তৈরি হয়নি। সঙ্ঘ অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্য পালনের কথাও জোর দিয়ে বলে। একই ভাবে ভারতীয় সংবিধানে যেমন মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট কথা রয়েছে তেমনই নাগরিক সমাজের মৌলিক কর্তব্য বোধের কথাও রয়েছে।

পরাধীন ভারতে যখন ভারতের 'স্ব'-এর বোধ ও চেতনাকে ব্রিটিশ এবং মুঘল শাসকরা ধ্বংস করছিল সেই সময় ভারতের 'স্ব'কে ফিরিয়ে আনতে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। ভারতীয়দের অধিকার, ভারত ভূমিতে ভারতীয়দের দাবি, ভারতীয়দের স্বাধীনতা এবং ভারতকে জাগরণের মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারত স্বাধীনতার ৭৮ বছর অতিক্রম করেছে। তাই ভারতীয় সমাজকে নাগরিক সমাজের মৌলিক অধিকারের প্রেক্ষিতে মৌলিক কর্তব্যবোধকে বেশি করে ভাবতে হবে। এই কাজের কথাই সঙ্ঘ তার শতবর্ষে পঞ্চ পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম নাগরিক কর্তব্যবোধের কথাকে বেশি করে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছে।

শতবর্ষে সঙ্ঘের পঞ্চ পরিবর্তনের একটি হলো নাগরিক কর্তব্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করা। এটা একমাত্র নাগরিক কর্তব্যের মাধ্যমেই সম্ভব। সেই জন্য সার্বজনীন জীবনে শুচিতা, সততা ও পারদর্শিতা পালন করতে হবে। সার্বিক ভাবে দেশের মানুষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে। তবে কেবল মাত্র সাংবিধানিক অধিকার নয়, নাগরিক কর্তব্য বিষয়েও সচেতন হতে হবে। দেশভক্তির ভাবকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দিতে হবে। ভারতীয় অধিবাসী হিসেবে প্রাথমিক ভাবে ভারতের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। নাগরিক সমাজকে দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে। দেশের জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় প্রতীককে সম্মান জানাতে হবে। জাতীয় সম্পত্তি এবং দেশের জনসেবায় নিয়োজিত কর্মকাণ্ডের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যগুলি হলো দেশের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব, যা সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী ১৯৭৬ দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সংবিধান ও জাতীয় প্রতীককে সম্মান করা, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা এবং শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া এমন ১১টি কর্তব্য রয়েছে। সঙ্ঘ ভারতীয় সমাজের দায়িত্ব কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করার কাজ গত ১০০ বছর ধরে বিভিন্ন স্তরে করে আসছে।

সংবিধানের ধারা ৫১-ক অনুযায়ী মৌলিক কর্তব্যসমূহগুলি হলো—

১. সংবিধান মেনে চলা এবং এর আদর্শ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান করা।

২. স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করা, মহৎ আদর্শকে লালন ও অনুসরণ করা।

৩. ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করা।

৪. দেশকে রক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে জাতীয় সেবা প্রদান করা।

৫. ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বৈষম্য নির্বিশেষে ভারতের সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা এবং মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

৬. দেশের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে সম্মান ও সংরক্ষণ করা।

৭. বন, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়ন করা এবং জীবজন্তুর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।

৮. বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতা এবং গবেষণা ও সংস্কারের মানসিকতা বিকাশ করা।

৯. জনসম্পদ রক্ষা করা এবং সহিংসতা পরিহার করা।

১০. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্যকলাপের সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য চেষ্টা করা, যাতে জাতি সর্বদা উচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে।

১১. ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি সকল শিশুকে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া (পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য)।

প্রথমেও মূলত ১০টি কর্তব্য ছিল, যা ২০০২ সালে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এখন মৌলিক কর্তব্য ১১টি হয়েছে।

সঙ্ঘ যেহেতু দেশকে ভারতমাতা হিসেবে ভক্তি করে তাই স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সব সময় সম্মান প্রদর্শন করে। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সঙ্ঘ প্রথম থেকেই সংকল্পবদ্ধ। দেশের সকল মাতৃভাষাই ভারতীয় ভাষা। সঙ্ঘ ভারতীয় ভাষা নিয়ে কোনো রকম সংকীর্ণতাকে স্থান দেয় না। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় জল-জমি-জঙ্গল-জানোয়ার নিয়ে বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল। দেশ রক্ষায় স্বয়ংসেবকরা কোনো ভাবেই পিছিয়ে থাকে না। প্রত্যন্ত এলাকায় দুর্যোগ, বন্যা, ঝড়ে সবার আগে সেবাকাজে এগিয়ে থাকে স্বয়ংসেবকরা। দেশ ভাগের সময় উদ্বাস্তু মানুষের পাশে সঙ্ঘ সবার আগে এগিয়ে এসেছিল। তাই পরাধীন ভারত থেকে স্বাধীন ভারতে সঙ্ঘের কর্তব্য নিষ্ঠা, ভাবনা আজ বিশ্বজুড়ে আলোচনার ভরকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

সঙ্ঘ হলো স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দলের অনুপ্রেরণায় তৈরি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। শাসক বা রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়; সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, আর্থিক পরিসরে ভারতের পরিপূর্ণ উত্থানের ভাবনায় কাজ করাকে পরম কর্তব্য বলে মনে করে। এখন প্রাণ দেওয়ার সময় নয়, জীবন উৎসর্গ করার সময় নয় এখন ভারতকে নির্মাণ করার জন্য ভারতের জন্য বেঁচে থেকে নিজেদের যোগদানকে সম্পূর্ণ করাই প্রধান কাজ। তাই আগামী দিনে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত। ফলে প্রত্যেক ভারতীয়কে নাগরিক কর্তব্য পালনে অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে।

(লেখক ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কর্মকর্তা)
(অনুবাদ : ড. সুমন চন্দ্র দাস।)

With Best Compliments from -

SRESTH PRODUCTS PVT. LTD.

Dealing in all kind of edible oil

49, Strand Road,
Kolkata - 700 007

বার বার সংবিধান অপমানিত হয়েছে কংগ্রেসি শাসনকালে

পুলকনারায়ণ ধর

ভারতের সংবিধান প্রণীত হয় ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে এবং জনগণের উদ্দেশ্যে তা অর্পিত হয়। এই দিনটি 'সংবিধান দিবস' হিসেবে প্রতিপালিত হয়। এই সংবিধান রচনা পর্বের কিছু কথা, এর পরবর্তীকালে কিছু কথা এবং এর পরবর্তীকালে কিছু পরিবর্তন সাধন প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব। তার আগে একটি বিষয় বলা দরকার যে সংবিধানে ভারতবর্ষকে দু'টি নামে অভিহিত করা হয়েছে। সংবিধানের ১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে 'India that is Bharat is a union of States'। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশকে দু'টি নাম দিয়ে চেনানো হয়নি। আমাদের দেশে সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল ভারতকে সনাতনী ভাবনায় অভিহিত করা হবে নাকি তার সঙ্গে ইংরেজদের দেওয়া যে ইন্ডিয়া কথাটি আছে সেটিও থাকবে পাশ্চাত্য ধারা বজায় রাখার জন্য। এই দ্বন্দ্বের উপশম ঘটে দু'টি নাম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

ভারত ও ইন্ডিয়া এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব সংবিধানে প্রোথিত হওয়ার পর থেকেই সংবিধানের এবং ভারতের রাজনীতির দ্বন্দ্বগুলি বা বিপরীত শক্তিগুলির সক্রিয়তা বিদ্যমান। সে অন্য প্রসঙ্গ। তার আগে আমাদের আরও কয়েকটি বিষয় জানতে হবে। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল এবং এর প্রস্তুতির পেছনে ছিল ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব। ১৯৪৬ সাল থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে, পাকিস্তান তৈরি হলো। যে গণপরিষদের তত্ত্বাবধানে সংবিধান তৈরি হয়েছিল, সংবিধান তৈরি হওয়ার আগে পাকিস্তান তৈরি হওয়ার ফলে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৮৯ থেকে কমে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো ২৯৯ জনে। এরা সকলেই ভারতীয়। সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। ১৯৪৯ সালের যে সংবিধান তৈরি হলো তা কার্যত The Government of India Act, 1935-এর অনুকরণে। পরবর্তীকালে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির দাবিতে ১১০ বারেরও বেশি এই সংবিধান সংশোধিত হয়েছে। মূল সংবিধান তৈরি করতে অর্থাৎ গণপরিষদে গৃহীত হওয়ার জন্য ১৯৪৬-এর পর প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হয়েছিল। গণপরিষদে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল জনমত সংগ্রহের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য সংগ্রহের পর কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। কয়েক হাজার মতামত চিঠিপত্র গণপরিষদের অধ্যক্ষের কাছে এসেছিল। অর্থাৎ সংবিধান স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে মানুষের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল।

মূল সংবিধানটি হস্তলিখিত। দীর্ঘ ৬ মাস ধরে তা লেখা হয়েছিল। প্রায় ২৫৪টি কলম ব্যবহৃত হয়েছিল। ক্যালিগ্রাফিতে এই সংবিধান লিখেছিলেন প্রেমবিহারী নারায়ণ রাইজাদা। সংবিধানের পাতায় পাতায় নানা চিত্র অঙ্কিত আছে। এইসব ছবি এঁকেছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু এবং তার শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা।

এই চিত্রমালার গভীর তাৎপর্য এই যে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতা সনাতনী সংস্কৃতি ভারতীয় সংবিধানের মূলমন্ত্র। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনে এই মূলমন্ত্রের ভাব অনেকটা নষ্ট করা হলো। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ১৯৭৬ সালে অনুপ্রবেশ ঘটল secular ও socialist শব্দ দু'টি।

প্রস্তাবনার এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রয়েছে একটি আইনগত প্রশ্ন, সেটি হলো ১৯৪৯ সালে যে প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে এবং ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি থেকে যে সংবিধান কার্যকর হয়েছে সেই সংবিধানের ১৯৪৯ সালের গৃহীত প্রস্তাবনার মধ্যে ১৯৭২ সালের কিছু কথা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এটা কীভাবে বলা যায়

এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধানও পরিবর্তিত হয়, সংবিধান কোনো নিশ্চল পদার্থ বা বস্তু নয়। সংবিধান নিউটনের সূত্রে বাঁধা নয়। সংবিধান চলে ডারউইনের সূত্র ধরে। সদা পরিবর্তনীয়।

'We adopt, enact and give to ourselves this constitution on the 26th Day of November 1949'? এই শব্দ দু'টি তো সে সময় গৃহীত হয়নি। প্রস্তাবনাকে এইভাবে সংশোধন করা যথার্থ নয়, আইনশুদ্ধও নয়। প্রস্তাবনা থেকে এই শব্দদু'টি বাদ দেওয়া উচিত।

এভাবে যখন তখন ইচ্ছে মতো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণে যেকোনো শব্দ বা কথা প্রস্তাবনার ১৯৪৯ সালে তৈরি করা প্রস্তাবনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সংবিধানের কোনো ধারার পরিবর্তন ঘটলেও প্রস্তাবনা অপরিবর্তনীয় রাখার কথা। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রস্তাবনার বিভিন্ন শব্দ পরিবর্তন করা অনৈতিক কাজ। সংবিধান প্রণেতাদের প্রতিপন্ন করতে হয়নি ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। কিন্তু একটি জটিল কুটিল আবর্ত সৃষ্টির জন্য আবির্ভাব হয়েছে এই শব্দদু'টির। ভারতীয় সভ্যতা ও সনাতন ধর্ম সর্বদাই সকল উপাসনা পদ্ধতি ও মানুষের তীর্থস্থান, সকল মত-পথের প্রতি উদার ও সহিষ্ণু। এই শব্দটি একেবারেই পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা একটি অপ্রয়োজনীয় শব্দ।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বর্তমানে রাজনীতির জগতে চলছে এক অধর্মের চর্চা। সাম্প্রদায়িকতার চরম প্রকাশ ঘটিয়ে ভারতের সনাতন ধর্মের উপর আঘাত আসছে। তথাকথিত সংখ্যালঘুদের তোয়াজ করতে সংবিধানে বপন করা হয়েছে একের পর এক বিশেষ অধিকার যা একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে জওহরলাল নেহরু করে গেছেন। এর ফলে সংবিধানের যে মূলনীতি গণতন্ত্রের যে মূল স্তম্ভ Right to equality তা অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সেকুলারিজমের সংজ্ঞা কী? এই প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেকুলারিজম শব্দটিকে যে যেমন খুশি ব্যবহার করে চলেছে। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে হিন্দুদের যেকোনো ভাবেই বিরোধিতা করা। এটা ভারতীয় সংবিধানে একটি ক্ষতচিহ্নের মতো স্থান পেয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার নিরিখে মুসলমানরা ভারত ভাগ করেছে বিভক্ত বা খণ্ডিত ভারত ভূমিতেও তারা আবার একই তথাকথিত সংখ্যালঘুর পতাকা তুলে আগের মতোই রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করবার চেষ্টা করছে। তা সমর্থন করে চলেছে কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিজাতীয় দলগুলি। এদের উদ্দেশ্য, নির্বাচনে ভোট বৃদ্ধি করা। এইভাবে প্রতিনিয়ত সংবিধানের অপব্যবহার ঘটে চলেছে।

ভারতে স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয়েছিল। এই আবহের মধ্য দিয়েই জন্ম হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের এবং পাকিস্তানে ইদানীংকালেও এই রাজনৈতিক আবহ খুব প্রকট এবং তারই সাফাই দিতে দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয় 'বহুত্ববাদের দেশ' বা 'কান্ট্রি অব প্লুরালিজম্' এবং 'মিশ্র সংস্কৃতি' অর্থাৎ কম্পোজিট কালচার। এই সংস্কৃতির ভিত্তিটা কী হতে পারে? বাইরে থেকে যারা এসেছে তারা সকলেই ভারতের মাটিতে ভারতমায়ের কোলে স্থান পেয়েছে কিন্তু ভারতের সংস্কৃতির ভিত্তি তো তারা স্থাপন করেননি। এই ভিত্তিটা কী? এই ভিত্তি অবশ্যই ভারতীয়। এই ভারতীয় ভিত্তি ও সংস্কৃতিকে উৎপাদিত করে বিদেশি সংস্কৃতিকে এখানে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার চেষ্টা চলছে সংবিধান সংশোধনীর আড়ালে। একটু একটু করে কংগ্রেস তা করে গেছে। সুপ্রিম কোর্ট একটি মামলায় (Santosh vs HRD Ministry 1994) এই প্রশ্নের বিচারে প্রাসঙ্গিক ভাবে বলেছে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঠিক মতো বুঝতে হলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে বিদ্যালয়ের কোনো স্তর থেকেই পাঠ্য করা আবশ্যক।

সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় অংশ হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায় যেখানে মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গ এবং তার ব্যবহার নাগরিক স্বার্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে বাক্‌স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্বাধীনতা ও অধিকার। বাক্‌স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের যিনি সবচেয়ে বড়ো ধ্বজাধারী বলে প্রচারিত সেই জওহরলাল নেহরু এই বাক্‌স্বাধীনতার ওপর তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। কংগ্রেসি রাজনীতিতে বা সরকারের ক্ষুদ্র স্বার্থে যদি বাক্‌স্বাধীনতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে তিনি তা খর্ব করেছেন। সংবিধান তৈরির পর থেকে ভারতের সংবিধানের সংশোধন হয়েছে প্রায় ১১০ বার কিন্তু প্রথম কোপ পড়ে জওহরলাল নেহরুর হাতে।

ভারতবাসী সংবিধানের সবচেয়ে বড়ো অপব্যবহার দেখেছিল ১৯৭৫ সালে। ইন্দিরা গান্ধী নিজের গদি রক্ষার জন্য জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। এই জরুরি অবস্থার সময় সমস্ত মৌলিক অধিকার থেকে নাগরিকরা বঞ্চিত হয়। সমস্ত প্রতিষ্ঠান-সহ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারের সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ খর্ব হয়। প্রতিটি সংবাদ সরকারের আমলাদের সেন্সর লাভ করে প্রকাশ করতে হয়। ইন্দিরা গান্ধীর সময় ভারতীয় সংবিধানের সমস্ত ন্যায়-নীতি তছনছ হয়ে গিয়েছিল। সংবিধান ভেঙে পড়েছিল। আজ যারা গণতন্ত্র নিয়ে এবং সংবিধানের ওপর আক্রমণ হচ্ছে বলে চিলচিৎকার করছে, তারাই অসংখ্যবার রাজ্যগুলির নির্বাচিত সরকার ভেঙে দিয়েছিল। এইভাবে সংবিধান ধ্বংসের প্রবণতা বর্তমান এনডিএ সরকার রোধ করেছে।

২০১৪ সালের পর অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যে সকল পরিবর্তন সংবিধানে সাধিত হয়েছে তা প্রত্যেকটি হচ্ছে দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে। যা কংগ্রেস সরকারের আমলে ছিল নেতিবাচক, সেই প্রবণতা সাহসিকতার সঙ্গে সংশোধন করেছে এনডিএ সরকার। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারার বিলুপ্তি সাধন ঘটিয়ে জম্মু-কাশ্মীরকে সংবিধানের সমস্ত নিয়মের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে এবং ভারতের প্রকৃত অবিচ্ছেদ্য অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলির মতো একই আসনে স্থান দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের কতকগুলি কর্তব্যের উল্লেখ প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে এটাই অভিপ্রেত। এই কর্তব্য পালনের মধ্যে লিখিত আছে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন জ্ঞাপন করা, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। কিন্তু ইদানীং একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সঙ্গীত বা স্তোত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে।

সংবিধান ও গণপরিষদে গৃহীত বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতকে এরা সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে তাকে অবমাননা করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। এমনকী এটাও দেখা গেছে সংসদে বন্দে মাতরম্ গীত হওয়ার সময় অবজ্ঞা ভরে পেছন ফিরে সভা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন কোনো মুসলমান সদস্য। এসব আগামীদিনের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত। সংবিধান প্রসঙ্গে এর রচনার গণপরিষদে ড. ভীমরাও আম্বেদকর বলেছিলেন, 'If things go wrong under the new constitution, the reasons will not be that we had a bad constitution, what we will have to say is that man was vile' (4 February 1948).

সংবিধান দেশের আইনের গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র গ্রন্থ। দেশ সমাজ অর্থনীতি ক্রম অগ্রসরমান। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা আবর্তিত হয়। সুতরাং এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধানও পরিবর্তিত হয়, সংবিধান কোনো নিশ্চল পদার্থ বা বস্তু নয়। সংবিধান নিউটনের সূত্রে বাঁধা নয়। সংবিধান চলে ডারউইনের সূত্র ধরে। সদা পরিবর্তনীয়। কিন্তু এই বিষয়টি চলমান সময়কে ঠিক মতো ধরতে পারা বা বুঝতে পারার মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে, যে প্রজ্ঞা ও দৃষ্টি দেশকে একটি সত্যিকারের ভারতীয় সংবিধান উপহার দিতে পারবে। সেই নেতৃত্বের কার্যকরী ভূমিকা আজ প্রত্যক্ষ করছে দেশবাসী। □

‘দশ মিনিটে ডেলিভারি’ ইতি

গিগ শ্রমিকদের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের। ই-কমার্স সংস্থাগুলির বহুল প্রচারিত ও বিতর্কিত স্লোগান— ‘১০ মিনিটেই ডেলিভারি’— অবশেষে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের সঙ্গে সাম্প্রতিক বৈঠকে এই বিষয়ে নীতিগত ঐকমত্যে পৌঁছনো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দশ মিনিটে ডেলিভারির টার্গেট চালু হওয়ার পর থেকেই গিগ শ্রমিকদের উপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে ডেলিভারি সম্পন্ন করার তাগিদে বহু ক্ষেত্রেই সড়ক নিরাপত্তা বিধি উপেক্ষিত হচ্ছিল। এর ফলে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছিল। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ শুরু থেকেই এই প্রবণতার বিরোধিতা করে আসছিল এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে দাবি তুলেছিল।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ই-কমার্স সংস্থাগুলি তাদের বিজ্ঞাপন ও প্রচার সামগ্রী থেকে ‘১০ মিনিটেই ডেলিভারি’ সংক্রান্ত শব্দবন্ধ সরিয়ে নেবে। পাশাপাশি গিগ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা, কাজের সময় নির্দিষ্ট করা এবং ন্যূনতম নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার দিকেও প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলির বক্তব্য, এতদিন গিগ শ্রমিকরা কার্যত নির্দিষ্ট কাজের সময় ও সামাজিক সুরক্ষা ছাড়াই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে কাজের পরিবেশে ভারসাম্য ফিরবে এবং অপ্রয়োজনীয় শ্রমদান অনেকটাই কমবে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলের একাংশের মতে, দ্রুত ডেলিভারির প্রতিযোগিতায় যে বেপরোয়া মনোভাব তৈরি হয়েছিল, এই সিদ্ধান্ত তার উপর কার্যকর লাগাম টানবে। এতে শুধু গিগ শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষিত হবে না, সাধারণ মানুষের সড়ক নিরাপত্তাও অনেকাংশে নিশ্চিত হবে। রক্ষিত হবে পরিবহণ বিধি। সব মিলিয়ে, ‘১০ মিনিটেই ডেলিভারি’ বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার ই-কমার্স ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণের সূচনা বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। গিগ শ্রমিকদের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজ রোড, বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

প্রার্থী হোক রাষ্ট্রচেতনা সম্পন্ন, সৎ ব্যক্তি

দীর্ঘ বাম অপশাসনের পরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কোনোরকম নীতি, আদর্শ, সংস্কৃতি সম্পন্ন রাজনৈতিক দলকে সামনে না পেয়ে বর্তমান শাসক দলকে ক্ষমতায় এনেছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন এটা কোনো রাষ্ট্রবাদী দল নয়, এটা একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল। নীতি, আদর্শের বালাই নেই, চোর, চিটিংবাজ, অসৎ, দুষ্কৃতীদের নিয়ে তৈরি একটা কাটমানি খাওয়ার কোম্পানি। সামনে ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। বিগত নির্বাচনগুলোর থেকে এই নির্বাচন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এবার পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার ভোট। বর্তমান শাসক দলের সীমাহীন মুসলমান তোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই ভোট। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গভূমি আজ বিকশিত ভারতের কতটা পিছনে পড়ে গেছে তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝতে পারছেন।

এই রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির অন্তিম যাত্রা শুরু হয়েছে। শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে পঠনপাঠন করানোর জন্য সরকারিভাবে কোনো নজরদারি নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অল্প বয়সে স্মার্ট ফোন ধরিয়ে দিয়ে ১৮ বছর হওয়ার আগেই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। চাকরির বদলে বিভিন্ন ভাতা দিয়ে মানুষকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। চাকরি নেই, শিক্ষা নেই, শিল্প নেই, কলকারখানা নেই রাজ্য পিছনের দিকে যাচ্ছে। শুধু শাসনের পরিবর্তন হলেই হবে না, শাসকের পরিবর্তন করতে হবে। আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাতে রাষ্ট্রচেতনা সম্পন্ন সৎ মানুষের প্রয়োজন যারা মানুষের হয়ে, সমাজের হয়ে কাজ করবেন। রাজ্যের আর্থিক, সামাজিক অবস্থা খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। তাই রাজ্যের আর্থিক ও সামাজিক হাল ফেরাতে শাসনের পরিবর্তন দরকার। এই পরিবর্তন করতে হলে দলের প্রার্থীদের অবশ্যই সদ্‌গুণ সম্পন্ন, গ্রহণযোগ্য, মানুষের কাছের ও কাজের লোক হতে হবে। রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চায় কিন্তু রঘুডাকাত থেকে কালু ডাকাতের হাতে ক্ষমতার বদল চায় না।

যারা নিজেদের আখের গোছাতে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভোটে দাঁড়াতে চায় তাদের নির্বাচনে টিকট না দেওয়াই ভালো। একজন চাষি, ক্ষেতমজুর, হলেও যদি সৎ ও আদর্শবান হয় তাকেই টিকিট দেন রাজ্যের মানুষ দু’হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালিকে বাঁচাতে আগামী বিধানসভায় সঠিক প্রার্থী নির্বাচন প্রয়োজন।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

দেশে দায়িত্বশীল বিরোধী নেতার প্রয়োজন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর বর্তমানে যে জেহাদি আক্রমণ চলছে তা দেখেশুনে মাঝে মধ্যে দেশের কংগ্রেস মার্কা মানুষ আক্ষেপ করে বলে, ‘আজ যদি ইন্দিরা

গান্ধী থাকতেন তাহলে এতো দিনে বাংলাদেশকে ঠাণ্ডা করে দিত।' আমিও তাদের কথায় আংশিক সমর্থক। তবে এমন পরিস্থিতিতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো কোনো বিরোধী নেতাও অবশ্যই প্রয়োজন। নচেৎ নয়। ১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের প্রাক্কালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিরোধী নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করতে যান। তাদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অস্থিরতা নিয়ে কথা হয়। দেখা করে বেরিয়ে আসার পর ইন্দিরা গান্ধী সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি একজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম কিন্তু ফিরছি একজন রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে দেখা করে। এই ছিল বিরোধী নেতার ভূমিকা। আর আজ দেশের বিরোধী দলের নেতার আচরণ কেমন? এখনকার বিরোধী দল পার্লামেন্ট ডেকে যুদ্ধের সব সিদ্ধান্ত জানতে চায়। মনে হয় তারা ভারতবিরোধীদের সজাগ করে দিতে চায়।

বর্তমানে দেশের বিরোধী দল ভারতের মঙ্গল চায় না। তাদের জোটসঙ্গী তৃণমূল দলও চায় যেন-তেন প্রকারেণ রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে। নীতি আদর্শ জলাঞ্জলি দিতেও কার্পণ্য করে না। তাই তারা যেকোনো চটকরে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। যোগ্য শিক্ষক হয় বঞ্চিত। খোলা বাজারে চাকরি বিক্রি হয়। কয়লা, বালি, পাথর ও গোরু চোরা চালান হয়।

গরিবের রেশনের চাল দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী। এতে মানুষ প্রতারিত হয়। চোরা পথে প্রতিবেশী দেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ করিয়ে রাতারাতি তাদের এদেশের নাগরিক বানিয়ে জনবিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট করা হয়েছে। এই ভাবেই রাষ্ট্রবিরোধী দলগুলির বিরোধী জোট আমাদের পায়ের তলার মাটি কেটে আবার উদ্বাস্তু বানানোর অপচেষ্টায় রত। আজ দেশে নরেন্দ্র মোদীর মতো শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী আছে ঠিক, এর সঙ্গে দরকার একজন দায়িত্বশীল যোগ্য বিরোধী দলনেতা।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

হাদি'র সঙ্গে হিরো আলমের তুলনা চলে!

হাদির সঙ্গে হিরো আলমের তুলনা চলে, না, তাও চলে না, হিরো আলম তো বাংলাদেশের পক্ষে ছিল, হাদি পাকিস্তানি? ওসমান হাদি পরকীয়া ও চাঁদার টাকা ভাগাভাগির কারণে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে নিহত হলেও আপাতত জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের পাশে শায়িত আছেন। কতদিন থাকবেন বলা মুশকিল। তবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা প্রথম সুযোগেই তাঁকে নজরুলের পাশ থেকে সরিয়ে দেবে তা বলা বাহুল্য, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আঁতকে ওঠার কিছু নেই, কবর থেকে মৃতদেহ তুলে আগুনে পোড়ানো তো আপনারাই শিখিয়েছেন। দীপুচন্দ্র দাসকে পুড়িয়ে মারতে যে ঘৃণার আগুন আপনারা জ্বালিয়েছেন, ওই ঘৃণা এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হবে না। একটি জাতির কতটা দুর্ভাগ্য হলে হাদি-মাদিকে নিয়ে আলোচনা হয়। হাদি কে? রাজাকারের বংশধর। হাদিকে নিয়ে লাফালাফি করছে কারা? রাজাকারের নাতিপুতিরা! তাই-বা বলি ক্যামনে! এরমধ্যে তো ড. ইউনুস আছেন, তিনি তো নাতিপুতি নন, তিনি রাজাকারের বাপ। একাত্তর সালে তিনি দেশের বাইরে ছিলেন, দেশে থাকলে রাজাকার কমান্ডার হতেন। বলা যায় না, হয়তো টিক্কা খানের সহচর হতে পারতেন। সুতরাং হাদি রাজাকারের নাতিপুতি হলেও তার সমর্থকরা রাজাকার, রাজাকারের বাপ-মা ও নাতিপুতি। এক কথায় রাজাকার বা পাকিস্তানপন্থী পরাজিত শক্তির সমর্থক গোষ্ঠী। এঁরা এখন দেশজুড়ে লাফাচ্ছে। হাদির লাশ পাকিস্তানিরা নিয়ে গেলে কেমন হয়? এদের ধৃষ্টতা কতটা হলে এঁরা মুজিব হলের নাম পরিবর্তন করে শহিদ ওসমান হাদি রাখে? হল কর্তৃপক্ষ সেটা অনুমোদন দিয়েছে। বেইমান, নিমকহারাম কত প্রকার ও কী কী, ২০২৪-এ মেটিক্যুলাস ষড়যন্ত্র না হলে জাতি জানতেই পারতো না! কোথায় স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আর কোথায় রাজাকারের নাতি হাদি! বাংলাভাষায় বলে, 'কোথায় তালগাছ, আর কোথায় ...'। এই হাদি নাকি এখন নতুন প্রজন্মের 'আইকন'। তাহলে এই নতুন প্রজন্মের অবস্থাটা কী তা বুঝতে হয়তো কারও অসুবিধা হবার কথা নয়! হাদি অসভ্য তা না হয় বুঝলাম, পুরো প্রজন্মটাই কি অসভ্য ও অসুস্থ? হাদি'র নামের আগে 'শহিদ' লাগানো হয়েছে, দেশে আজকাল চোর-ডাকাত, রাজাকার মরলেও শহিদ হয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় কবি নজরুলের পাশে হাদিকে কবর দিয়ে জাতীয় কবিকে অপমান করা হয়েছে। কোথায় কবি নজরুল, আর কোথায় লম্পট হাদি, কথায় বলে, 'কোথায় আগরতলা আর কোথায় চৌকিরতলা'। এটি বাংলা সাহিত্যের অপমান। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপমান। শোনা যায়, ভারত তাদের কবি নজরুলের কবর সসম্মানে তাদের দেশে কবির জন্মস্থান চুরুলিয়ায় নিয়ে যেতে চায়। ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর অনুরোধ ফেলতে পারেননি, তাই তাকে ঢাকায় কবর দেওয়া হয়েছিল। আজ ইন্দিরাও নেই, শেখ মুজিবও নেই। ভারত এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতেই পারে। যে জাতি নজরুলকে সম্মান দিতে পারে না, তার কবর সেখানে রাখার কোনো যুক্তি নেই।

বাঙ্গালির একটি গৌরবময় অতীত আছে। বর্তমানে কোথাকার এক রাজাকার-শাবক হাদি-মাদিকে ধরে এনে হিরো সাজিয়ে লাফালাফি করা জন্তু-জানোয়াররা বাঙ্গালি নয়; বন্যরা বনে সুন্দর, ওরা পাকিস্তানে। এদের পাকিস্তানেই পাঠাতে হবে, 'পাঞ্জেরী রাত আর কতদূর?' অন্ধকার যত ঘনীভূত হয়, সূর্যোদয় ততই ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশে প্রতিদিন অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে, বিজয় ততই হাতছানি দিচ্ছে। একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে আর একবার সমূলে ধ্বংস করে শুভশক্তির বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। ইরানে মোল্লাতন্ত্রের পতন হচ্ছে, বাংলাদেশে জেহাদিতন্ত্রের পতন নিশ্চিত। ঘৃণার যে আগুন ওরা সৃষ্টি করেছে, সেই আগুনেই ওদের আত্মাহুতি দিতে হবে। শুধু একটু অপেক্ষা, আর একটি মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক্ষায়, জাগো বাহে—।

—শিতাংশু গুহ,
নিউইয়র্ক।

সুস্থ সন্তানের জন্য বিয়ের আগে-পরে রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন

মৌ চৌধুরী

বিষয়টি সকলেই কম-বেশি জানেন। তবে দেখা গিয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে ভুল ধারণা, সচেতনতার অভাব, গাফিলতি বা ইচ্ছে করে নয়তো 'যা হবে দেখা যাবে' এমন মনোভাব নিয়ে চলেছেন।

অসুখটা থ্যালাসেমিয়া। সকলেই জানেন এই রোগ প্রথম দেখা গিয়েছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। গ্রিক ভাষায় থ্যালাসা যার অর্থ সমুদ্র আর ইমিয়া হলো রক্ত। এক কথায়, এই অসুখের মূল বিষয় রক্ত। থ্যালাসেমিয়া কখনোই ছোঁয়াচে নয়। তবে অবশ্যই জিন ঘটিত এবং কিছুটা বংশগত। এই অসুখের সঙ্গে বিবাহেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এটা কোনো অজানা বিষয় নয় যে নারী-পুরুষ দু'জনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হলে তাদের সন্তানের থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। তবে চিকিৎসকদের মতে মা-বাবার মধ্যে একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক হলে সন্তানের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

বহু পরিবার আছে যারা সন্তানের বিবাহের সময় কুষ্ঠি ঠিকুজি, জন্মছক মিলিয়ে নেন। নিজেদের বিশ্বাসে কুষ্ঠি ঠিকুজি নিয়ে গণৎকারের কাছে তাঁরা ছুটে যেতেই পারেন। তবে এর পাশাপাশি সন্তানদের রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা দেখে নিলে পরবর্তী প্রজন্ম সুস্থ থাকবে। এখন সমস্যা হলো, বেশিরভাগ বিবাহ প্রেমঘটিত। এখানে আবেগটাই বেশি কাজ করে। তাই থ্যালাসেমিয়া বা অন্যান্য পরীক্ষা তাদের প্রায় সকলের কাছে গুরুত্বহীন। কিন্তু আবেগ সরিয়ে রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভালো রাখতে সচেতন হলে বিবাহের পরেও এই পরীক্ষা করাতে কোনো সমস্যা নেই। চিকিৎসকদের মতে মাতৃগর্ভে আসার বারো সপ্তাহের মধ্যে সন্তান এই অসুখে আক্রান্ত কিনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যায়। পরীক্ষার ফলাফল অনুকূল না হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

কিছুদিন আগে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পে এই লেখিকাকে যেতে হয়েছিল। সেখানে এই অসুখে আক্রান্তদের অসহায় মা-বাবাদের বুকফাটা আর্তনাদ, আক্ষেপ চোখে জল এনে দিয়েছিল। এই ক্যাম্পে এক বছরের নীচে থেকে শুরু করে একজন মাত্র পঁচিশ বছর বয়সি ছেলে ছিল। বাকিরা সবাই তিন থেকে শুরু করে দশ বছর। ওদের সবাইকে প্রতি বছর প্রয়োজন অনুযায়ী দুই থেকে দশ বার পর্যন্ত রক্ত দিতে হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের ওষুধ খেতে হয়। খুব মর্মান্তিক হলেও সত্য যে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তদের বাবা-মায়েরা সবাই জানেন, যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তাঁদের সন্তান মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। যে কোনো দিন কোল খালি হবেই। এই ক্যাম্পে উপস্থিত অষ্টম শ্রেণীতে পড়া একটি মেয়ে খুব মনোবেদনার সঙ্গে ক্লান্ত চোখে বলেছিল, 'আমার মা-বাবা যদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিয়ে করতেন তবে আমাকে রোজ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিন গুনতে হতো না।'

থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তদের মা-বাবারা প্রথম দিকে বুঝতেই পারেন না এই অসুখের বিষয়টি। দিনদিন শরীর অবসন্ন হয়ে পড়া, সামান্য ধারাবাহিক জ্বর, রক্তস্বল্পতা-সহ অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। অনেক সময় চিকিৎসকেরাও মূল অসুখ ধরতেই পারেন না। যখন ধরা পড়ে গোটা পরিবারটাই অসহনীয় বেদনায় ভেঙে পড়ে। এরপরেই শুরু থ্যালাসেমিয়ার সঙ্গে অসম যুদ্ধ এবং নিশ্চিত পরাজয়।

সকলেই জানেন, থ্যালাসেমিয়া জিনবাহিত রোগ। এই অসুখে আক্রান্তদের রক্তে অক্সিজেন বহনকারী গ্লোবিন প্রোটিন তৈরি হয় না। সঠিক হিমোগ্লোবিন তৈরি না হওয়ার কারণে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয়, যার প্রভাবে রক্তাল্পতা দেখা যায়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রাও দ্রুত কমতে থাকে। এর পাশাপাশি আলফা ও বিটা এই দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়ার কথা চিকিৎসকেরা বলেন। এইসব কারণেই রক্ত দিতে হয় রোগীকে। মোটকথা, যতই রক্ত দেওয়া যাক বা ওষুধ দেওয়া হোক গভীর সত্য যে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত বুকের ধন ওই সন্তানের পরমায়ু খুবই কম।

এই ক্যাম্পে ভেজা চোখে এই থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশু, বালক-বালিকাদের দেখে ভাবছিলাম, আমরাই ওদের নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমরা মা-বাবারা এত নিষ্ঠুর হতে পারি। অথচ সব জেনেও সন্তান হারানোর অনন্ত দুঃখ, কষ্ট, বেদনা বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু সামান্য আবেগ, কিছুটা বেপরোয়া মনোভাব এবং 'এসব ফালতু বিষয় নিয়ে ভাবার সময় নেই' এসব আদবকায়দা সরিয়ে রেখে বিয়ের আগে বা পরে নিজেরাই থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা এই পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াই যায়। পাশাপাশি একটি চরম অসচেতনতার বিষয়ে বলি, এই লেখিকার সন্তানসম ভাইপোর বিয়ের আগে কন্যাপক্ষকে রক্ত পরীক্ষার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ঠিকুজি, জন্মছক ইত্যাদিতে বিশ্বাসী কন্যার অধ্যাপিকা মা এই প্রস্তাব পত্রপাঠ নাকচ করে দিয়েছেন। সনাতনী রীতিতে বিশ্বাস রেখে যেমনভাবে জন্মকুণ্ডলী বিচার করা যেতে পারে, সেই একই প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়ে বিবাহের আগে রক্তপরীক্ষাও বিশেষ জরুরি। তবে সুস্থ, স্বাভাবিক সংসারের সঙ্গে নীরোগ নবপ্রজন্মের মুখ দেখতে পাবে সব পরিবার। □

মাইল্ড অটিজম ও হোমিওপ্যাথি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার একটি জটিল স্নায়ু বিকাশজনিত অবস্থা, যা একজন মানুষের যোগাযোগের দক্ষতা, সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং চারপাশের পরিবেশকে অনুভূত করার ক্ষমতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এই অবস্থা প্রকাশিত হয়। এর নানা মাত্রা রয়েছে। ইন্ডিয়ান স্কেল ফর অ্যাসেসমেন্ট অব অটিজম বা ইসা-র স্কোর অনুসারে ৭০ থেকে ১০৬-এর মধ্যে কারও মূল্যায়নের ফল থাকলে যে 'মাইল্ড অটিজম'-এর আওতায় পড়ে। ১০৭ থেকে ১৫৩-এর মধ্যে ফল হলে 'মর্ডারেট অটিজম'-এর আওতায় পড়ে। ১৫৩-এর বেশি হলে সিভিয়ার অ্যাটাক বলে ধরা হয়।

মাইল্ড অটিজম বিষয়টি কী?

অটিজম নিয়ে কিছু গড়পড়তা ধারণা রয়েছে যার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। ফলে বিষয়টি চিহ্নিত না হওয়ার একটি সম্ভাবনা থেকে যায়। অনেকে বলেন আমার ছেলের মাইল্ড অটিজম রয়েছে। তাঁরা আশা করেন একটি গঠনগত প্রশিক্ষণ থেরাপি ইত্যাদি হলে তাঁদের সন্তান অটিজমের স্পেকট্রাম থেকে বেরিয়ে আসবে। বাস্তবে কিন্তু মাইল্ড অটিজম 'মাইল্ড' নয়। তারও নিজস্ব কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

● সামাজিক সংকেত বুঝে কথোপকথন চালিয়ে যেতে এবং সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়। শিশুরা সরাসরি চোখে চোখ রেখে কথা বলা এড়িয়ে যায়। অনেকেই নিজে থেকে কথা শুরু করতে পারে না। নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়, কিন্তু কথা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। নিছক মজা বা হালকা ব্যঙ্গাত্মক কথা অন্যরকম প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে এদের মধ্যে।

● একই কাজ বারবার করে যাওয়ার দিকে ঝোঁক থাকে। মাইল্ডলি অটিস্টিক শিশুর কথোপকথন নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সেই সঙ্গে প্রবল অস্থিরতা কাজ করে তার মধ্যে। হয়তো সুইচ বোর্ড নিয়ে তার প্রবল আগ্রহ কিংবা বোতাম দেখলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। এই শিশুদের যে বিষয়ে ঝোঁক সেটা নিয়েই তারা প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সামাজিক সংকেত মেনে কথা বলতে পারে না বলে এই শিশুগুলি চরম একাকীত্বে ভোগে। সেখান থেকে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশনের মতো সমস্যা আসে। হয়তো একজন অটিজম স্পেকট্রামের আওতাধীন মানুষ বারবার ফোন করে কথা বলতে চাইছেন আপনার সঙ্গে, আপনি তখন ব্যস্ত। তাঁকে একটি নির্দিষ্ট সময় বলুন যখন আপনি কথা বলতে পারবেন। তাঁকে জানান আপনার ব্যস্ততার কথা। অটিস্টিক মানুষ স্ট্রাকচার্ড নিয়মে স্বচ্ছন্দ, সে নির্দিষ্ট উত্তর চায়।

● সংবেদনশীলতার তারতম্য হয় এই অবস্থায়। তার উপর নির্ভর করে অ্যাংজাইটির বিষয়টি। অটিজমের আওতায় থাকা কোনো শিশু আলো, শব্দ, গন্ধ বা স্পর্শের প্রতি অতিসংবেদনশীল হতে পারে। কেউ আবার সংবেদনশীল হয়। কেউ হয়তো জল অসম্ভব ভালোবাসে। কারও কাছে আবার জল এতটাই ভয়ের যে, শাওয়ার চালালে সে চিৎকার করতে শুরু করে। তিনি আরও বললেন অটিজমের আওতায় থাকা সন্তানের নানা অদ্ভুত প্রশ্নে উত্তর দিতে হয় বাবা-মাকে। সে হয়তো জিজ্ঞাসা করছে সাতশো বছর তার বাবা ও মা বাঁচবে না কেন? সে মূলত উদ্বেগ থেকে প্রশ্নটি করছে। সে তার ভালোবাসার জগৎটাকে অটুট রাখতে চায়। সেই সংবেদনশীলতা নিয়ে উত্তর দিতে হবে।

অটিজম মুক্ত সমাজ গড়ার কথা এখনও ভাবা সম্ভব নয়, কারণ এর যথাযথ ব্যাখ্যা এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিছু গবেষণা বলে, পরিবেশ ও জিনগত কারণ একযোগে এই অবস্থায় জন্ম দেয়। পরিবেশগত কারণের মধ্যে রয়েছে দূষণ। এছাড়া আনুষঙ্গিক শারীরিক সমস্যা, যা মা ও বাবার দু'জনেরই হতে পারে। বেশি বয়সে সন্তান ধারণের বিষয়টিও একটি কারণ বলে দাবি করা হয়। জিনের গঠনমূলক পরিবর্তন ও অটিজমের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। নির্দিষ্ট কারণ না পাওয়ার ফলে বিষয়টি নিয়ে এত ভুল ধারণা রয়েছে।

অভিভাবকদের জন্য পরামর্শ :

● শিশু অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের মধ্যে রয়েছে তা শনাক্ত হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বিষয়টিকে অস্বীকার বা অবহেলা করবেন না। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, বিশেষ শিক্ষক প্রত্যেকের সাহায্যের প্রয়োজন হবে শিশুর।

● স্পষ্ট ও সহজভাবে সন্তানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। নিতে পারেন স্পিচ থেরাপিও অকুপেশনাল থেরাপির সাহায্যও।

● নিয়মিত একটি গঠনমূলক পরিবেশ ও রুটিন তৈরি করতে হবে। শিশুটি যে বিষয়ে সংবেদনশীলতা চিহ্নিত করে কমানোর চেষ্টা করুন।

● অটিজম সম্পর্কে জানুন, প্রতিটি শিশুর শক্তি ও দুর্বলতা বিভিন্ন ধরনের। সাপোর্ট গ্রুপে যোগ দিন। একদিন হয়তো শিশুটি দারুণ কিছু করল, আবার একদিন কোনো কারণে তার আবেগের তীব্র বহিঃপ্রকাশ হলো। ধৈর্য ও সংবেদনশীলতা ছাড়া অটিজমের সঙ্গে মোকাবিলার এখনো কোনো অস্ত্র নেই। অটিস্টিক মানুষের সঙ্গে মিশলে বোঝা যায় কতটা নিষ্পাপ, সরল ভাবে তাঁরা পৃথিবীকে দেখেন। তাঁদের ভাবনা নতুন চিন্তার ও জন্ম দিতে পারে।

এই প্রতিবেদকের পিতা ডাঃ প্রকাশ মল্লিক প্রবীণ খ্যাতনামা হোমিও চিকিৎসক। তাঁর কাছে চিকিৎসা করানোর পর অনেক অটিজম রোগী বর্তমানে সুস্থতার দিকে। প্রসঙ্গত বলা ভালো যে তাঁরা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শেষ করে তবেই আমার পিতার কাছে এসেছিলেন।

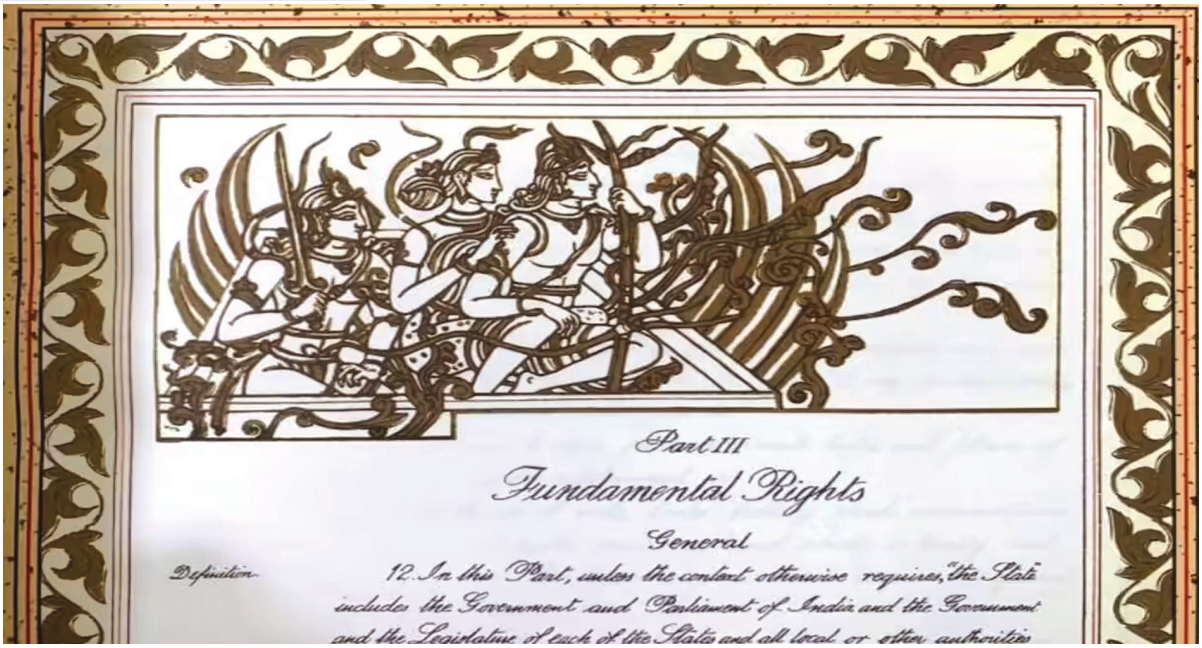

ভারতের সংবিধানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন

লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা 'লক্ষ্মীদা'

যে দেশের নিজস্ব কোনো লিখিত সংবিধান ছিল না, সেই দেশের প্রতিনিধিদের থেকে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পর বিশ্বের সবথেকে বড়ো আকারের সংবিধান তৈরি করতে হয়েছে। ভারতের সংবিধান রচনার সময় সংবিধান সভা এই সিদ্ধান্ত নেয় যে সংবিধান রচনার এই ঐতিহাসিক কাজটি হিন্দি ও ইংরেজিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে, চিত্র দিয়ে সাজিয়ে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হবে। তদনুসারে কাজ নির্ধারণ করা হয়। লেখার জন্য কাগজ, কলম, কালি ইত্যাদি নির্বাচন করা এবং চিত্রাঙ্কন করার দায়িত্ব বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর উপর অর্পণ করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত নন্দলাল বসু একজন চিত্রশিল্পী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংস্কৃতিক পুরুষ তো ছিলেনই, দূরদর্শী চিন্তাবিদও ছিলেন। হিন্দিতে লেখার দায়িত্ব বসন্ত কৃষ্ণ বৈদ্যকে এবং ইংরেজিতে লেখার দায়িত্ব প্রেম বিহারীনারায়ণ রায়জাদা 'সাক্সেনা'-কে অর্পণ করা হয়েছিল। তাঁদের প্রধান সহযোগী ব্যোহার রামমনোহর সিনহা হস্তলিখিত সংবিধানের পৃষ্ঠাগুলির সাজসজ্জা অঙ্কন করেছিলেন। চিত্র নির্বাচন এবং অঙ্কনের আগে নন্দলাল বসু সংবিধানটি গভীরভাবে পড়েন এবং কিছু আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জেনে নেন।

তাঁর নিশ্চিতভাবেই সুন্দর অনুভূতি হয়েছিল আর তাই সংবিধান সভা আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলি নির্ধারণ করেছিল, সেগুলি তিনি অর্থপূর্ণ শব্দে লিপিবদ্ধ করতে কোনো কার্পণ্য করেননি। কিন্তু এর মূলে যে ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও গৌরবময় অতীতের অনুভূতি বিদ্যমান, তা তাঁরা শব্দে বাঁধতে পারেননি। কারণ হলো, কেবল আইনি নথিপত্রের সাহায্যেই সংবিধান লেখা হয়েছে। আইনি ভাষা জটিল থাকে। একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে এই অভাব দূর করার উপায় হিসেবে চিত্রের মাধ্যমে এটিকে সরল ও বোধগম্য করার কাজটি তাঁকে করতে হবে, এটি তিনি ভেবেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই চিত্রগুলির মাধ্যমে তিনি সংবিধানের আত্মাকেই প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এমনটা বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি সংবিধান সভার সদস্য ছিলেন না, তবুও তিনি সংবিধানের প্রাণপ্রদানকারী প্রাণপুরুষ হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। নন্দলাল বসু সংবিধানের বিষয়গুলির ভাব ও মর্ম যাতে সবাই বুঝতে পারে এমনই চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন।

মোট ২২টি ভাগে লেখা সংবিধানের প্রতিটি ভাগে সেই ভাগের বিষয়

অনুসারে চিত্র তৈরি করা হয়েছে। ভারতের সাংস্কৃতিক পরম্পরার কথা মনে রেখে চিত্রগুলোর মাধ্যমে কোথাও সম্পর্কিত বিষয়ের উৎস, আবার কোথাও তার ক্রিয়ান্বয়নের ফলাফল দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভাগ ১-এর বিষয় হলো 'ভারতীয় ইউনিয়ন এবং তার রাজ্য ক্ষেত্র', যেখানে মহেঞ্জোদাড়োর প্রতীকচিহ্ন আঁকা হয়েছে, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে, যদিও আমরা বিভাজিত হয়ে গেছি, তবুও অখণ্ড ভারতই আমাদের স্বপ্ন। উল্লেখ্য যে, মহেঞ্জোদাড়ো আজকের পাকিস্তানে অবস্থিত। যদিও গান্ধীজী ভারত বিভাজন আটকাতে পারেননি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সেই সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বিভাজন একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা, অখণ্ড ভারতই আমাদের লক্ষ্য। এই মানসিকতার প্রতিফলন সংবিধান সভার দ্বারা স্বীকৃত অখণ্ড ভারতের চিত্র দিয়ে আঁকা প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমেও প্রকাশ পায়। ভাগ-২-তে নাগরিকত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে একটি গুরুকুলের চিত্রের মাধ্যমে নন্দলাল বসু এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যদি নাগরিকত্ব রক্ষা করতে হয়, তবে প্রতিটি নাগরিককে শিক্ষা ও সংস্কারে পরিপূর্ণ করতে হবে, যা গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব। তাই এর বিস্তার ঘটাতে হবে।

ভাগ ৩-এ মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহনকারী চিত্র আঁকা হয়েছে। লঙ্কা বিজয়ের পর নিজের রাজ্য অর্থাৎ রামরাজ্য পরিচালনার জন্য পুষ্পক বিমানে বসে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতামাতাকে দেখানো হয়েছে। ভাগ ৪-এ নীতি নির্ধারক তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অর্জুনকে গীতা উপদেশ দেওয়ার চিত্রটি আঁকা হয়েছে। এই চিত্রটি ইঙ্গিত দেয় যে, গীতা নীতি-নির্ধারক তত্ত্ব জেনে নেওয়ার জন্য শাসকদের উপযোগী একটি গ্রন্থ। প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য স্নেহ, প্রেম ও অহিংসার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ভাগ ৫ এবং ৬-এ ভগবান বুদ্ধ এবং ভগবান মহাবীরের চিত্র রয়েছে। সংবিধানের প্রায় অর্ধেক অংশ অর্থাৎ মোট ১৮৫টি অনুচ্ছেদ এই দুটি ভাগে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভাগ ৭-এ মৌর্য আমলের সমৃদ্ধি ও নির্ভীকতাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত বহনকারী চিত্র রয়েছে। ভাগ ৮-এ প্রশাসনিক দৃঢ়তার জন্য অর্থনৈতিক বিপ্লবের বার্তা দিয়ে লাফিয়ে ওঠা কুবেরের চিত্র রয়েছে। এই চিত্রটি দেখে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে তাকে শ্রীহনুমান বলে মনে করেন। শ্রীহনুমান বা বজরঙ্গবলী হলে হাতে গদা ও পশ্চাদ্ভাগে লেজ থাকা উচিত ছিল তা চিত্রটিতে নেই। ভাগ ৯-এ শাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করতে বিক্রমাদিত্যের দরবারের চিত্রটি এই ইঙ্গিত দেয় যে, দেশে ত্বরিত ও সঠিক

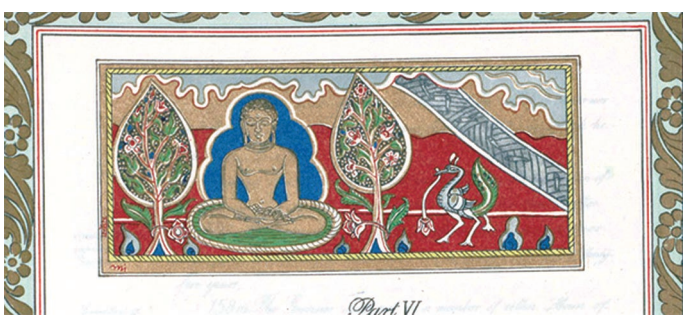

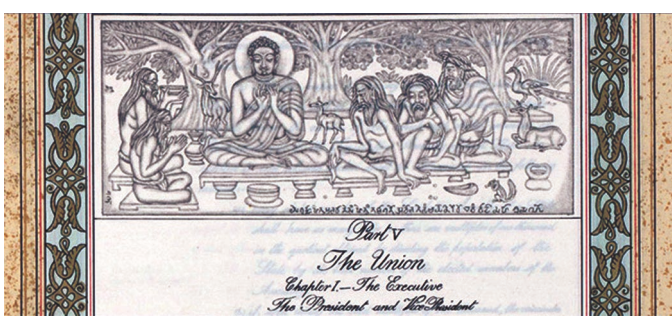

ন্যায়বিচার পঞ্চায়েতরাজ এবং পৌরসভাগুলি পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত। ভাগ ১০-এ দূরদূরান্তে বসবাসকারী তফশিলি জাতি ও উপজাতিদেরও যেন ভালো ও উন্নত শিক্ষা দেওয়া হয়, তা যেন সর্বসুলভ হয়, তাই নালন্দার প্রতীক চিহ্ন এবং সেখানকার সুসংস্কৃত পরিবেশের চিত্র দেওয়া হয়েছে। ভাগ ১১-তে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়কে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন করার পরম্পরার প্রতীক হিসেবে ঘোড়ার চিত্র দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সংবিধান রচনার সময়ই সর্দার প্যাটেলের দ্বারা দেশজুড়ে দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তীকরণ এই ভাগের বিষয় অনুসারেই হচ্ছিল।

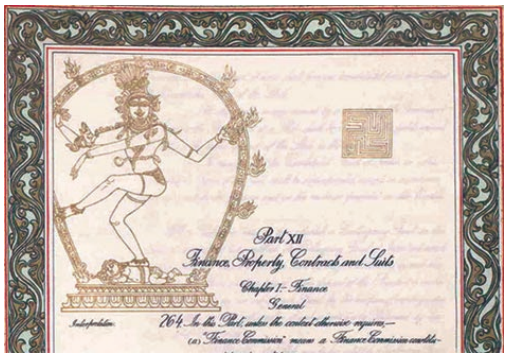

সংবিধান প্রণেতারা দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি তথা পরিচ্ছন্নতার কথা ভাগ ১২-তে লিখেছেন। এটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নন্দলাল বসু স্বস্তিক ও নটরাজের চিত্র যথাক্রমে শুভ ও আনন্দের প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত অসাবধানতার ফলে স্বস্তিকটি উলটো ছাপা হয়ে আছে এবং নটরাজের মূর্তির চিত্র কিছুটা খণ্ডিত হয়ে আছে। শুভ চিহ্নের এভাবে অশুভ হয়ে যাওয়ার ফলেই বারবার চেষ্টা করার পরেও আমরা ভারতে অর্থনৈতিক শুচিতা আনতে পারছি না। বিভিন্ন কারণের ভেতরে এটা একটা কারণ হতে পারে যে সংবিধানে দুটি ছবি অসাবধানতাবশত ভুলভাবে ছাপা হয়েছে। এই প্রযুক্তিগত ভুলটি শীঘ্রই সংশোধন করার ব্যবস্থা করলে দেশের মঙ্গল হবে। পরবর্তী ভাগ ১৩-তে ব্যবসাবাণিজ্যের সাফল্যের জন্য ভগীরথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত বহনকারী চিত্র রয়েছে। গঙ্গামাতার অবতরণে রাজা সগর, অসমঞ্জস্য, অংশুমান ও দিলীপের পর পঞ্চম প্রজন্মের রাজকুমার ভগীরথ সাফল্য পেয়েছিলেন।

"চার প্রজন্মের তপস্যার ফল,
ভগীরথ প্রচেষ্টা পাবন।
অন্তঃসলিলা, মাতৃরূপিণী
গঙ্গার অবতরণ।।"

ভাগ ১৪-তে ইসলামি অত্যাচারকে গুরুত্ব না দিয়ে আকবরের দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে পারস্পরিক সমন্বয় স্থাপনের প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিয়ে আকবরের দরবারের চিত্র দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অধীন পরিষেবা এই ভাগের বিষয়। ভাগ ১৫-তে ভোটারদের জন্য এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে নির্বাচনে নেতা বেছে নিতে হলে তারা যেন পরাক্রমী ও ত্যাগী নেতা নির্বাচিত করেন। পরাক্রমের প্রতীক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ এবং ত্যাগের প্রতীক গুরুগোবিন্দ সিংহকে এখানে চিত্রিত করা হয়েছে। ভাগ ১৬-তে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ ও টিপু সুলতানকে চিত্রিত করে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে মাতৃশক্তি এবং সংখ্যালঘু সমাজের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। বিপরীত মানসিকতার দুই ব্যক্তিত্বকে একসঙ্গে রাখার কারণ সম্ভবত এটাই ছিল যে দুজনই ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। আকবর ও টিপু সুলতানের দ্বারা সংঘটিত অত্যাচারকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের সাকারাত্মক কাজকে স্মরণ করে তাদের ইতিবাচক স্থান দেওয়ার এই উদারতা নন্দলাল বসুর হিন্দু মনের উদারতাই বলা যেতে পারে।

ভাগ ১৭-তে প্রশাসনিক ভাষার জন্য এবং ভাগ ১৮ জরুরীকালীন ব্যবস্থার জন্য গান্ধীজীর প্রচেষ্টার ছবি দেওয়া হয়েছে। হিন্দিভাষী না হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে হিন্দির জন্য আগ্রহী লাঠিধারী গান্ধীজী এবং জরুরীকালীন ব্যবস্থাপনার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে ডাণ্ডি অভিযান করা গান্ধীজীর চিত্র

আঁকা হয়েছে। ভাগ ১৯-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ্ সরকারের ব্যবস্থাপনার কথা স্মরণ করিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তার উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই চিত্রটি এই অর্থে অনুপ্রেরণাদায়ক যে ১৫ আগস্টের খণ্ডিত স্বাধীনতার আগে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার সফল প্রয়াস নেতাজী সুভাষচন্দ্র শুরু করেছিলেন।

আন্দামান, নিকোবর ও মণিপুরের স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা তিনি হাতে নিয়েছিলেন। সংবিধানের শেষের ভাগ ২০, ২১ ও ২২-এ যথাক্রমে আকাশ, জমি ও জল অর্থাৎ নভঃ-স্থল-জল এই তিনটির রক্ষা এবং প্রদূষণমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সুরক্ষার ইঙ্গিত দেওয়া বিষয় চিত্রিত করা হয়েছে। এতে জল-স্থল-নভঃ সেনারও ইঙ্গিত দেখা যেতে পারে। সংবিধানের ২২টি ভাগে অঙ্কিত ২৮টি চিত্রে এই তথ্য ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জানা উচিত।

সংবিধান রচনা থেকে শুরু করে তার বাস্তবায়ন পর্যন্ত যাত্রার ৭৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। জাতির সামনে আসা সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করার জন্য এই সংবিধান আমাদের সঠিক দিকনির্দেশ করে কিন্তু ভাষার জটিলতার কারণে সাধারণ মানুষের কাছে তা বোধগম্য নয়, তাই এর সরলীকরণ হোক, এটা সময়ের দাবি। প্রায় ১২৫টি সংশোধনের জটিলতার কারণে বিচারকদেরও রায় দেওয়ার সময় ধর্মসঙ্কটের পরিস্থিতি তৈরি হয়। যার কারণে রায় স্থগিত রেখে পরবর্তী তারিখ দেওয়াটাই তাদের জন্য একমাত্র পথ থাকে। সমস্ত সংশোধনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের পুনর্লেখন করা হোক এটাও সময়ের দাবি। চিত্রগুলিতে হওয়া প্রযুক্তিগত ভুল এবং ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির প্রবণতার কারণে মুঘল শাসকদের ছবি নেওয়ার তৎকালীন পরিস্থিতির মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া উচিত।

খণ্ডিত নটরাজ, উলটো স্বস্তিক, আকবরের দরবার ও টিপু সুলতানের মতো চিত্রগুলোর বিকল্প চিত্র নিয়ে চিন্তাভাবনার সঙ্গে আইনের জটিল ভাষার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় সংবিধানের পুনর্লেখন হওয়া উচিত।

ভারতের সংবিধানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম চিত্রসমূহ আর সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার মতো ভাষাতে পুনর্লেখন হওয়া এটা আজকের প্রয়োজন। এই নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনারও প্রয়োজন।

(লেখক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

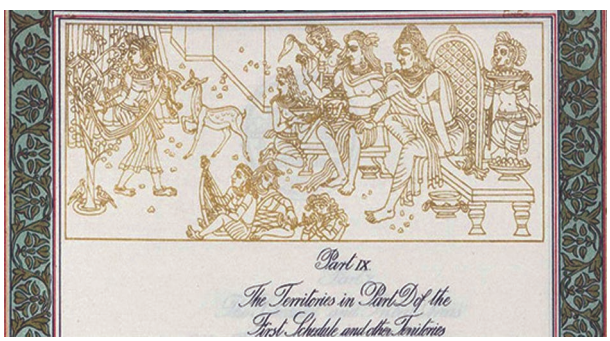

বিবেকানন্দ পাঠচক্র আয়োজিত 'স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা'

স্বামী বিবেকানন্দের পদরেণুধন্য উত্তর কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলের সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে এবং সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ'র সহযোগিতায় ৯ থেকে ১৩ জানুয়ারি পাঁচদিন ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলার আয়োজন করা হয়। মিলন মেলার উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বিমলাত্মানন্দ মহারাজ। বিভিন্ন দিনে স্বামীজী সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ সরূপ প্রসাদ ঘোষ, আইনজীবী অনিন্দ্য কুমার মিত্র, ডঃ শুভম আমিন, প্রব্রাজিকা অসক্তাপ্রাণা, সুপ্রতীপ চক্রবর্তী, রূপম দে, কর্নেল সব্যসাচী বাগচী, নীলাঞ্জনা রায়, ডঃ পল্লবী বসু দত্ত, ডঃ অনুপ গুপ্ত প্রমুখ। এবছর স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীত সম্মান প্রদান করা হয় স্বনামধন্য বংশীবাদক পদ্মশ্রী রোনু মজুমদার মহাশয়কে। কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন পণ্ডিত সন্দীপন সমাজপতি, স্বামী স্তুতানন্দ, নির্মলা ভট্টাচার্য, তমাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধায়, দিব্যেন্দু দাস বাউল ও আঁকন মজুমদার। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রণব কুণ্ডু (তবলা), পণ্ডিত শুদ্ধশীল চট্টোপাধ্যায় (সন্তুর), ঋষভ কোমল দে (সারেঙ্গি), সারণ্য সরকার (বংশী) ও সৌর্যদীপ্ত ভট্টাচার্য (সরোদ)। নৃত্য ও সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে বিবেকানন্দ পাঠচক্র, সংস্কার ভারতীর উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা ও হাওড়া নগর জেলার শিল্পীরা। সংস্কার ভারতীর নাট্যগোষ্ঠী পরিবেশন করে নাটক 'কেন চেয়ে আছ গো মা'। আবৃত্তিতে ছিলেন সঞ্চিতা সরকার। বন্দে মাতরম্ -এর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রতিদিন অখণ্ড বন্দে মাতরম্ পরিবেশন করেন যথাক্রমে শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী, ভরত কুণ্ডু, দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত দে ও তনুশ্রী মল্লিক।

বিভিন্ন সময়ে এই মিলন মেলা যাঁরা পরিদর্শন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য, আইনজীবী অজয় নন্দী, স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য, সঙ্ঘের সহ ক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট ও প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়। শেষদিন প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. সি ভি আনন্দ বোস। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন সুদীপ দত্ত, গোপাল কুণ্ডু, অরুণেন্দু দত্ত, ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু, ডাঃ তপন পাল ও দেবাংশু কর।

স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আঁটপুরে হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ১২ জানুয়ারি হুগলী জেলার আঁটপুরের বিবেকানন্দ আইডিয়াল পাবলিক স্কুলে হাতের

লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিষয় ছিল— স্বামীজীর বাণী, স্বদেশমন্ত্র এবং চিকাগো বক্তৃতা। পূর্ব সূচনানুসারে ছাত্র-ছাত্রীরা যথাসাধ্য সুন্দর ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে লেখার চেষ্টা করে। প্রত্যেককে মৌখিক প্রশ্নোত্তর বিভাগে লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। সবাই সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। অভিভাবকরাও খুবই উৎসাহী ছিলেন। বিচারকরূপে ছিলেন ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে।

বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল ও বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারীর উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী ও সমর্থ ভারত পর্ব উদ্‌যাপন

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল এবং বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের একনাথ বিভাগের উদ্যোগে কলকাতা শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সম্মাননীয় অতিথি ও বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারত বিবেকানন্দ শিক্ষা পরিষদের সহ সভাপতি, স্কটিশ চার্চ কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, বাণিজ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা প্রেসিডেন্সি কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দর মহাউদ্ধারণ মঠের শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, বিবেকানন্দ কেন্দ্রের জীবনব্রতী কার্যকর্তা তথা অখিল ভারতীয় কোষাধ্যক্ষ প্রবীণ দাভোলকর এবং একনাথ বিভাগ সঞ্চালক দেবাশিস লাহিড়ী। সম্মাননীয় অতিথিদের বরণ করে নেওয়ার পর স্বাগত ভাষণ রাখেন একনাথ বিভাগ প্রমুখ তরুণ কুমার জানা। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সৃষ্টি, তার উত্তরণ ও বিস্তার সম্পর্কে আলোকপাত করেন প্রবীণ দাভোলকর। বিধাননগর কার্যস্থান সহ সংযোজিকা মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীমৎ বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ স্বামীজী, গীতাপ্রসঙ্গ, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, স্বদেশ ও বিদেশে স্বামীজী বিষয়ে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন।

বিগত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত 'স্বামীজী জয়ন্তী' ও 'সমর্থ ভারত পর্ব' বিষয়ে বিভিন্ন কলেজের মধ্যে চলা 'ওয়াল ম্যাগাজিন কম্পিটিশন'-এ যোগদানের প্রস্তুতি এবং সেই উপলক্ষ্যে ঘটিত কর্মশালা সম্পর্কে নিজের অনুভব ব্যক্ত করেন একনাথ বিভাগ সাহিত্য সেবা প্রমুখ অনুরাধা চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে স্বামীজীর যুবসমাজ

সম্পর্কে ভাবনা, বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুবসমাজের অবস্থান, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে তাদের অবক্ষয়ের কারণ, এক্ষেত্রে তারা কতটা দায়ী এবং কতটা বড়োদের ত্রুটিবিচ্যুতি সে সম্পর্কে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দমদম সারদা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী দেবলীনা মাইতি স্বামীজীর স্বশেমন্ত্র পাঠ করেন।

শেষ পর্বে ছিল পুরস্কার বিতরণ। 'ওয়াল ম্যাগাজিন কম্পিটিশন'-এ যোগদানকারী কলেজগুলির মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী মধুসূদন নগর কার্যস্থানের 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিদ্যাভবন' মহাবিদ্যালয়; দক্ষিণেশ্বর নগরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী 'আদ্যাপীঠ অন্নদা বিএড মহাবিদ্যালয়'-এর ছাত্র-ছাত্রীদের; তিনটি বিশেষ পুরস্কার প্রাপক দক্ষিণেশ্বর নগরের 'অন্নদা বিএড মহাবিদ্যালয়, মধুসূদন নগর কার্যস্থানের 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন' এবং নেতাজীনগর কার্যস্থানের বেহালা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান এবং অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

সমস্ত ওয়াল ম্যাগাজিন নাটমন্দিরের প্রবেশদ্বারে সকলের দেখার জন্য রাখা হয়েছিল। বাংলা প্রকাশনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে পুস্তক প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অনুরাধা চট্টোপাধ্যায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দেবাশিস লাহিড়ী। মধুসূদন নগর কার্যস্থানের সহ সংযোজিকা মিতা দে'র শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কসবায় শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা জয়ন্তী উদ্‌যাপন ও বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ

কলকাতার রাজডাঙ্গা নারকেল বাগান মাঠ, কসবায় শ্রীমদভগবদ্‌গীতা সেবা সমিতির উদ্যোগে গত ১০, ১১ জানুয়ারি দুদিন ব্যাপী শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা জয়ন্তী ও বিশ্ব শান্তিযজ্ঞ এবং হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিন সকালে চক্রধারী কেশব-সহ বাড়ির গোপাল এবং এলাকার বিভিন্ন মন্দিরের ধ্বজ নিয়ে রাজডাঙ্গা আদি মন্দিরে একত্রীকরণ এবং নগর সংকীর্তন সহ শোভাযাত্রা করে অনুষ্ঠানস্থলে ভগবান চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ স্থাপন, প্রদীপ প্রজ্বলন করে পূজার্চনা শুরু হয়। অন্যদিকে লায়নস্ ক্লাবের সহযোগিতায় স্থানীয় মানুষদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির শুরু হয়। দুপুর ১২টায় বিগ্রহের ভোগ নিবেদন করে বিশ্রাম দেওয়া হয়। বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠানস্থলের রাস্তায় আলপনা প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ৩৩জন অংশগ্রহণ করেন। এর পরে গীতাজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। সন্ধ্যায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি ও শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীদের গীতা ও বেদান্তের প্রবচন শুরু হয়। রাত্রি ৮টায় নৃত্য ও ভক্তিগীত-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরদিন সকালে বিগ্রহের জাগরণ ও ভোগ নিবেদন। দুপুর ২টায় শুরু হয় গীতাপাঠ এবং বিশ্ব শান্তিযজ্ঞ। শেষে প্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যায় আরতি ও সংকীর্তন সমাপনান্তে গীতা ক্যুইজ, পুরস্কার বিতরণ, সম্মান জ্ঞাপন এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পর রাত্রি ৯.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ১০০ বর্ষে অভিনন্দন—

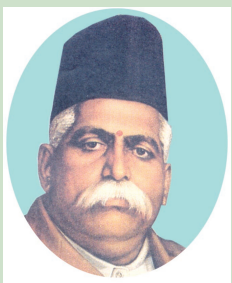

UMESH GANERIWALA

রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

'নর সেবাই নারায়ণ সেবা। রক্তদান করা ও করানো দুটোই আর্ত-পীড়িত মানবতার সেবা। বিশ্ব কল্যাণের জন্য ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর এই কাজের জন্য যুবা প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে আশেপাশের মানুষের মধ্যে নাগরিক কর্তব্যবোধের জাগরণ ঘটাতে হবে। তাহলেই ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত বানানোর স্বপ্ন সাকার হবে।' স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ১২ জানুয়ারি কলকাতার রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে স্থানীয় মাহেশ্বরী ভবনে এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী ভাষণে কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের পূর্বতন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, সংস্থার অধ্যক্ষ রাজেশ আগরওয়াল (লালা), হুতাত্মা রামকুমার-শরদ কুমার কোঠারীর ভগ্নী পূর্ণিমা কোঠারী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় আগরওয়াল, ডাঃ ভরত গুপ্তা, পূর্ব মহা পৌর ও পার্ষদ মীনাদেবী পুরোহিত, পার্ষদ বিজয় ওঝা, সহযোগী সংস্থা শ্যাম সেবা ভাবনার সংরক্ষক রামজীবন কনোড়িয়া প্রমুখ। পঙ্কজ চৌধরী সংস্থার পরিচয় প্রদান করেন। প্রভাত জৈন 'মধুবন খুশবু দেতা হ্যায়' একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শিবিরে ১১০ জন রক্ত দান করেন। রক্তদান শিবির কুশল সঞ্চালন করেন সন্দীপ জৈন এবং শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রজত চতুর্বেদী।

কার্যক্রম সফল করতে সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন সঞ্জয় মণ্ডল, অশোক জয়সোয়াল, প্রদীপ আগরওয়াল, ভাগীরথ সারস্বত, অনিতা বুবনা, পঙ্কজ চৌধরী, পবন গুপ্তা, অভিষেক বজাজ, আনন্দ জয়সোয়াল, বিশাল বাগলা, রোহিত শর্মা, রাজীব জৈন, সমর পাণ্ডে, তরুণ জয়সোয়াল, হিমাংশু রস্তোগী, রাজলক্ষ্মী রাঠী, পূনম গৌণ্ড, নির্মল কনোরিয়া, বিকাশ জৈন, সচিন গুপ্তা প্রমুখ।

হুগলী জেলার মথুরাবাটি গ্রামে জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস তথা জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি হুগলী জেলার মথুরাবাটি গ্রামে সমাজ সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন একটি শিক্ষামূলক উদ্যোগ হিসেবে বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্বোধন করা হয়। কল্যাণী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সহযোগিতায় নবনির্মিত এই পাঠাগারের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এদিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল রক্তদান শিবির, যেখানে ২৬ জন রক্ত দান করেন। ১০০ জন গরিব মানুষের হাতে মশারি তুলে দেওয়া হয় এবং ১০ জন বয়স্ক মানুষকে তাঁদের চলার সুবিধার জন্য লাঠি দেওয়া হয়। সান্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের যোগদান চোখে পড়ার মতো ছিল। সেখানে পঞ্চভূত সংস্কৃত ব্যান্ডের মনোমুগ্ধকর সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি গানের পরিবেশনা গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্যামল কুমার চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সন্তু পান এবং কল্যাণী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্য সুব্রত রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা অশোক রায় ও সদস্যা শ্রীমতী মলি রায়।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

হারানো পত্রিকা—পাঁচ

বিজলি ঝলকের চমক ‘বিজলী’র পাতায়

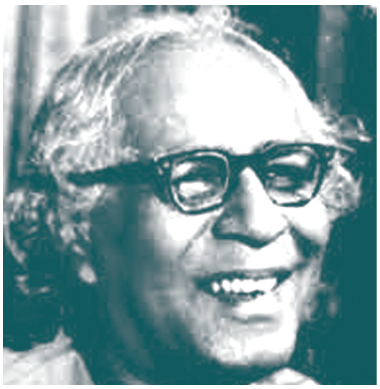

নলিনীকান্ত সরকার

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থমকে যাওয়া একটা সময়। বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতেই স্তিমিত বিপ্লবী আন্দোলন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের রূপ জনমনে ছড়ায় নতুন আলো। সেই আন্দোলনের রূপ দেখে মনে মনে আতঙ্কিত ইংরেজ। সেই আতঙ্ক থেকে এই গণআন্দোলনকে ভিন্নমুখী করার জন্য ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার বিধি কার্যকর করল ব্রিটিশ সরকার ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। মুক্তি পেলেন আন্দামানে নির্বাসিত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বঙ্গের বিপ্লবীরা।

আন্দামান ফেরত বিপ্লবীরা দেখেন দেশের অবস্থা বদলে গিয়েছে অনেকটাই। বিপ্লবী আন্দোলনের হোতা শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক টানে বঙ্গ ছেড়ে পণ্ডিচেরিবাসী। অন্যান্য নেতারাও অনেকেই মত ও পথ বদলেছেন। এরকম পরিস্থিতিতে নতুন করে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। তাই সাময়িক দ্বিধা কাটিয়ে নিজেদের কথা বলার এবং জনমনে স্বাধীনতার স্পৃহাকে তীব্রতর করার জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা।

সেই সময় কাগজ বের করাও কিন্তু খুব একটা সহজ ছিল না। প্রথমত অভাব অর্থের। তারপর সরকারি খবরদারি এবং কড়া নিয়মকানুনের বেড়া টপকানো এবং অবশেষে কাগজকে জনপ্রিয় করে তোলা।

বারীন্দ্রকুমার এবং তাঁর সহযোগীরা দেশে বিপ্লবী আন্দোলন গড়তে চান। কিন্তু সে পথে রয়েছে নানা বাধা। তাই নতুন সাহিত্য চেতনায় দীপ্ত একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবেন তাঁরা। সে সময় মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী চলছে রমরমিয়ে। তার মধ্য থেকে পাঠক আকর্ষণ রীতিমতো পরিশ্রমসাধ্য। তাই তার মধ্যে কোনো একটি ভিন্ন পথের পথিক হলেন তাঁরা।

চলচ্চিত্র তখন বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠছে কিন্তু সে বিষয়ে কোনো পত্রিকা নেই। তাই সিদ্ধান্ত, চলচ্চিত্র বিষয়ক একটি ব্রডসিট সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করা হবে। নাম হবে ‘বিজলী’ অথবা ‘আকাশ প্রদীপ’।

শুরু হলো তৎপরতা। টাকার জোগাড় হলো। পত্রিকার নাম ‘বিজলী’-ই ঠিক হলো। এবার পত্রিকা প্রকাশের জন্য সরকারি অনুমতি আদায়ের চেষ্টা। বারীন্দ্রকুমার তখন চিত্তরঞ্জন দাশের ‘নারায়ণ’ পত্রিকা সামলাচ্ছেন। আবার তিনিই নতুন পত্রিকার মূল উদ্যোক্তা। তাই তাঁরই সম্পাদক হওয়ার কথা। কিন্তু সরকারের তৎকালীন নীতি তাঁদের ভাবিয়ে তুলল। পূর্বতন বিপ্লবী বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে সরকারি মনোভাব খুবই কড়া। তাঁরা পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি চাইলে বিপুল পরিমাণ অর্থ চাওয়া হয় জামিনজমা হিসেবে। তাই নিজেরা সামনে না এসে নতুন কাউকে সম্পাদক প্রকাশক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সেই মতোই আবেদন করা হয় এবং অল্প পরিমাণ জামিনজমাতেই পত্রিকা প্রকাশের অনুমতিও পাওয়া যায়।

সেই অনুমতি অনুসারে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক ‘বিজলী’। চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম পত্রিকা হিসেবে আবির্ভাবেই সাড়া জাগায় ‘বিজলী’। পত্রিকাটির সম্পাদক হন নলিনীকান্ত সরকার। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর।

নলিনীকান্ত তখন লালগোলারাজের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ। কলকাতা থেকে বারীন্দ্রকুমার লিখলেন, “তুমি হবে ‘বিজলী’র সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর। ‘বিজলী’র সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে তোমার উপর। ...তুমি কলকাতায় এলে ওঠো তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব কিংবা কোনো আবাসিক হোটেলে। সেই ঠিকানা থেকে তুমি ‘বিজলী’ বের করতে ইচ্ছুক, এই মর্মে দরখাস্ত করতে হবে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিটের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। এখন কাগজ বের করতে হলে সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হয়। পুলিশ রিপোর্টে দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সিকিউরিটি ডিপোজিটের অঙ্ক স্থির করেন। আমাদের সম্পর্ক আছে জানলে, ‘বিজলী’র জন্য সিকিউরিটি বাবদ অনেক টাকা ধার্য করবেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।” (নলিনীকান্ত সরকার। আসা যাওয়ার মাঝে, পৃ. ১৮২-১৮৩১)।

বারীন্দ্রকুমারের এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, কিছুটা বাধ্য হয়ে রাজবন্দিদের মুক্তি

দিলেও তাঁদের সম্পর্কে সরকারের নজর ছিল বড়োই কড়া। নানা সরকারি আইনে সবসময় তাঁদের হয়রানি করা ছিল সরকারের লক্ষ্য। সরকারের এই নীতির ফলে জনমানসেও জমাট বাঁধতে থাকে নানা ধরনের ক্ষোভ-বিক্ষোভের মেঘ। সরকার অবশ্য নির্বিকার— নিজের সিদ্ধান্তে অটল।

সরকারের ওই ধরনের নীতিকে ফাঁকি দিতেই বারীন্দ্রকুমাররা কাগজের সম্পাদক করেন নলিনীকান্ত সরকারকে। ওই কাগজটি প্রকাশের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সচ্চিদানন্দ সেনগুপ্ত, অরুণ সিংহ এবং দীনেশরঞ্জন দাস।

নানা পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, 'বিজলী'-র সাপ্তাহিক সংস্করণের পর ১৩৩০ সালে প্রকাশিত হয় 'পাক্ষিক বিজলী'। সম্পাদক হন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ নিজেই। ১৩৪০ সালে প্রকাশিত হয় 'মাসিক বিজলী'। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মনে হয়, 'মাসিক বিজলী'-র সঙ্গে মূল 'বিজলী'র কোনো সম্পর্ক ছিল না। সম্ভবত 'বিজলী'র বিলুপ্তির পর ভিন্ন মালিকানা এবং সম্পাদনায় একই নামে প্রকাশিত হয়েছিল ওই 'মাসিক বিজলী'।

'বিজলী'-র প্রথম সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৮৪) ছিলেন সেকালের এক নামকরা সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, গায়ক ও গবেষক। জন্ম তাঁর মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা এলাকার জগতাই গ্রামে। শৈশব ও কৈশোর কাটে তাঁর ওই গ্রামেই। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পুলিশের খাতায় তাঁর নাম ওঠেনি। কৈশোরে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

ভক্ত ও বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান নলিনীকান্তর ছোটোবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার দিকে একটা টান ছিল। সেই টানেই বরদাচরণ মজুমদার, যোগী কালীপদ গুহরায় প্রমুখ সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁদের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিচেরিতে তিনি প্রথম শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে পরিচিত হন এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে সেখানকার আশ্রমবাসী হন। সেখানেই প্রয়াত হন তিনি।

নলিনীকান্তর লেখা প্রথম আধ্যাত্মিক কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি হাসির গানের রচয়িতা ও গায়ক হিসেবে নাম করেন। তাঁর জীবনের একটি বড়ো কীর্তি 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর বিখ্যাত সম্পাদক শরৎ পণ্ডিতের জীবনী রচনা। শরৎ পণ্ডিত বা দাদাঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় করে ছবি বিশ্বাস জাতীয় পুরস্কার পান।

শরৎ পণ্ডিত বা দাদাঠাকুরের পত্রিকাতেই নলিনীকান্তর সাংবাদিকতার হাতে খড়ি। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় নলিনীকান্তর প্রথম গ্রন্থ 'কাঞ্চনতলার কাপ'। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় 'শ্রীনিবিড়ানন্দ নকল নবীশ' ছদ্মনামে 'সাহিত্য সংস্কার' প্রবন্ধ প্রকাশের পরই সাহিত্যিক মহলে তাঁর পরিচিতি ঘটে। প্রথম থেকে অর্থাৎ ১৯২০ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক। অবশ্য ১২২৮ সালে সম্পাদক হিসেবে ঘোষিত হয় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর নাম। ১৩২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় কেবল শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর নাম। ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি আসে অরুণ সিংহ ও দীনেশরঞ্জন দাসের হাতে। সম্পাদক ছিলেন তাঁরাই। সম্ভবত এরপরেই সাপ্তাহিক 'বিজলী'র বিলুপ্তি ঘটে। নলিনীকান্ত সরকার অবশ্য ততদিনে যুক্ত হয়েছেন অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো-তে গায়ক হিসেবে। ১৯৩০/৩১-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন 'বেতারজগৎ' পত্রিকার সম্পাদক।

চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও প্রথম থেকেই বিপ্লবী চেতনা ও জাতীয়বোধেরই বাঁধা ছিল পত্রিকাটির মূল সুর। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে সে কথা। পত্রিকাটির চতুর্থ বর্ষের ৩৭তম সংখ্যায় 'নিবেদন' শিরোনামে সম্পাদকের বয়ান---'' ...বারীন্দ্রকুমার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তেজের সহিত বলিলেন, 'এই পচাগলা সমাজটার গতিবিধি না করিতে পারিলে 'দেশ' বলে চীৎকার করলে কিছুই হবে না।''

তদানীন্তন সাময়িক পত্রের ভাষা অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত বা যৎসামান্য লেখাপড়া জানা লোকের পক্ষে বিশেষ বোধগম্য নয়, এই বিবেচনায় বারীন্দ্রকুমার স্থির করিলেন যে, অতি সহজ ও সরল ভাষায় বাঙ্গালির জাতীয় সমস্যাগুলি একে একে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে। এবং শুধু বক্তৃতায় নয়, কাজে এইসব সমস্যা নিরসন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই 'বিজলী'র সৃষ্টি হইয়াছিল।' (১৬ শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল)।

চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা হলেও 'বিজলী'-তে বিপ্লব নিয়ে যেসব লেখা ছাপা হতো তাতে স্পষ্ট সময় ও পরিস্থিতির কারণেই বিপ্লববাদীরা এখন ভিন্ন চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছেন। সেই সঙ্গে অবশ্য বলা হয়, যে কারণে বিপ্লববাদের প্রকাশ ঘটেছিল, বোমা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয়েছে। ভয় ভেঙেছে লোকের। সাধারণ মানুষও এখন স্বাধীনতার কথা ভাবছে এবং বলছে। 'বোমার আবির্ভাব ও তিরোভাব নিবন্ধে বলা হয়,—'বোমা এনেছিল বিপ্লবীরা একথা সবাই জানেন। কিন্তু কেন? বোমা মেরে জনকয়েক রাজকর্মচারীর মাথা উড়িয়ে দিলেই দেশ স্বাধীন হবে? না, এ ভুল ধারণা বিপ্লবীদের কস্মিনকালেও ছিল না।...

বোমা মেরেই যে দেশ উদ্ধার হবে, এ দুরাশা আমরা করিনি। তবে দেশের লোকে এক তরফা মার খেয়ে একবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল বলেই তাদের মনটা চাঙ্গা করবার জন্য বোমার আবিষ্কার। দেশব্যাপী বিপ্লবের যে আয়োজন চলছিল, বোমাটা তারই একটা অঙ্গমাত্র। বোমাই বিপ্লবের সর্বস্ব নয়।...

বিপ্লববাদীরা নির্ভীক চিত্তে স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন, দেশের লোক যখন অত্যাচারের ভয়ে স্বদেশি আন্দোলন ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন নিজেদের মাথা লুটিয়ে দিয়ে বিপ্লববাদীরা দেশের ভয় ভাঙ্গাবার চেষ্টা করেছিলেন। দেশের লোক আজ তাঁদের কার্যপ্রণালী মেনে না নিলেও তাঁদের আদর্শ মেনে নিয়েছে। নিতান্ত পচা মডারেট ছাড়া এখন সকলেই দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা চান।' (বিজলী, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৮/২৫ নভেম্বর ১৯২১)

প্রথম থেকেই 'বিজলী'-র অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'বৈঠক' বিভাগটি। ওই বিভাগে সাম্প্রতিক খবরাখবর এবং তার ওপর যথাযথ

মন্তব্য ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হতো। ওই ধারাতেই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তারকেশ্বরের মোহান্তের অনৈতিক কাজ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই থাকত তার বিবরণ। এক্ষেত্রে 'বিজলী' নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার এক নতুন নজির তৈরি করে। একবার যেমন লেখা হয়, ''বর্তমানে কংগ্রেস কর্তৃক তারকেশ্বর মন্দিরের ব্যবস্থা বিষয়ে বসুমতীকে আলোচনা প্রসঙ্গে তর্করত্ন মহাশয় বলেছেন যে, মন্দিরে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির পূজাদির ভিন্ন ব্যবস্থা আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। এতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। ব্রাহ্মণসভার সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে যারা সত্যাগ্রহ করে জেলে যাচ্ছে, তারা কি সবাই কুশীল ব্রাহ্মণতনয়? মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য জেলে যাবার বেলায় সব জাতির পক্ষেই সমান ব্যবস্থা আর মন্দিরে প্রবেশ ব্রাহ্মণেরই অধিকার!'' (চতুর্থবর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১৬ শ্রাবণ, ১৩৩১)। আবার এই 'বিজলী'-তেই প্রকাশ করা হয়। মোহান্তের সমালোচনা করে লেখা নজরুলের বিখ্যাত সেই 'মোহ-অন্তের গান'।

একইভাবে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি না দেবার যে কথা বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বলেন, তার সমালোচনা করে 'বিজলী' লেখে, 'পরকীয়া নইলে যে প্রেম হয় না আহা, ভক্ত গৌরাঙ্গদাস! অন্তিমে তোমার যেন শ্রীইংলন্ড লাভ হয়। ...মন্থরবেদী বর্ধমানের ভুড়িতে যে এত বুদ্ধি ছিল তা আমরা এতদিন বুঝতেও পারিনি। দুর্ভাগ্য আমাদের।' (বিজলী ১৮ মাঘ, ১৩৩০, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪)।

'বিজলী' পত্রিকায় গোপীনাথ সাহার গ্রেপ্তার, বিচার এবং ফাঁসির আদেশ সম্পর্কিত খবরগুলিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়।

সবমিলিয়ে সরকারের নানা অন্যায় নীতির সমালোচনা করে 'বিজলী' ভিন্ন ধরনের পত্রিকা হয়েও এক সাহসী জাতীয়তাবাদী পত্রিকার ভূমিকা নেয়।

'বিজলী'-র সংবাদ প্রসঙ্গ বাদ দিলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, প্রিয়ংবদাদেবী অথবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত কবি লেখকদের লেখা প্রায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো 'বিজলী'-তে। বিশেষ করে তুলনায় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় নবাগত নজরুল ইসলামকে সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে 'বিজলী' এক সৃজনশীল ভূমিকা নেয়। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায়। কিন্তু 'মোসলেম ভারত'-এর প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। সম্ভবত ওই পত্রিকার কার্তিক সংখ্যা প্রকাশিত হয় ফাল্গুন মাসে। তারই সুযোগ নেয় সাপ্তাহিক 'বিজলী'। 'মোসলেম ভারত'-কার্তিক সংখ্যার সমালোচনার নামে 'বিজলী' ওই কবিতাটি প্রকাশ করে দেয় ১৩২৮-এর ২২ পৌষ বা ১৯২২-এর ৬ জানুয়ারি।

এ সম্পর্কে নজরুলের কক্ষ-সঙ্গী মুজফ্‌ফর আহমেদ লিখেছেন, ''...'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম ছাপা হয়েছিল 'বিজলী' নামক সাপ্তাহিক কাগজে। ...সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রিতে। ...সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে আমি বসেছি এমন সময় নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় শোনাল। 'বিদ্রোহী' কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা।' (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা (১৯৬৯) পৃ. ২৩৫-২৩৬)।

মুজফ্‌ফর আহমেদের বয়ান অনুযায়ী এর পরের ঘটনা বেশ নাটকীয়। তাঁরা তখন থাকতেন ৩/৪ সি তালতলা লেনের বাড়িটির একতলায় একই ঘরে। সম্ভবত সেটা ১৯২১-এর ডিসেম্বরের শেষাশেষি। ৩ ডিসেম্বরের এক রাতে নজরুল পেনসিলে লিখে ফেলেন বিদ্রোহী কবিতাটি। মজফ্‌ফর আহমেদকে কবিতাটি শোনানোর কিছু পরেই ওই বাড়িতে আসেন 'মোসলেম ভারত'-এর সম্পাদক- পরিচালক আফজালুল হক। তিনি ছিলেন 'বিদ্রোহী' কবিতার দ্বিতীয় শ্রোতা। শুনেই তিনি কবিতার একটি কপি নিয়ে যান 'মোসলেম ভারত'-এ প্রকাশনের জন্য। এর কিছু পরেই আসেন বারীন্দ্রকুমারের সহযোগী-সহযোদ্ধা 'বিজলী'-র ম্যানেজার অবিনাশ ভট্টাচার্য। তিনি কবিতাটি শুনে বলেন, 'মোসলেন ভারত'-এ কবে বের হবে তার ঠিক নেই, তুমি এর একটা কপি দাও আমাকে, আমি ছেপে দিচ্ছি 'বিজলী'-তে। হলোও তাই। 'মোসলেম ভারত' প্রকাশের আগেই 'বিজলী' প্রকাশ করে বিদ্রোহী।

'বিজলী'-র সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার অবশ্য শুনিয়েছেন ভিন্ন কাহিনি। তাঁর বক্তব্য, নজরুল 'বিজলী'-তে কবিতাটি দেবেন বলে কথা দেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে 'মোসলেম ভারত'-সম্পাদক আগেই সেটি হস্তগত করেন।

হতাশ নলিনীকান্ত 'মোসলেম ভারত'-এর অফিসে যান। 'মোসলেম ভারত' কার্তিক সংখ্যার ছাপা চলছে তখন। নলিনীকান্ত কায়দা করে 'মোসলেম ভারত'-এর ওই সংখ্যার সূচিপত্রটি নকল করে নেন। তারপর 'মোসলেম ভারত' প্রকাশের দেরির সুযোগ নিয়ে কাগজে 'মোসলেম ভারত' কার্তিক সংখ্যার পর্যালোচনা করে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি ছেপে দেন।

'বিজলী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ আলোড়ন। পাঠকের চাহিদা মেটাতে 'বিজলী'-র ওই সংখ্যা আবারও ছাপতে হয়। দুবারে ছাপা হয়েছিল ২৯ হাজার, —এমনটাই জানা যায়। বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা।

বিশেষ করে নজরুলের কবিতার জন্য 'বিজলী'-র চাহিদা খুবই বেড়ে যায়। পত্রিকাটির বিষয়সূচির মধ্যে নাট্য সমালোচনা অংশটি ছিল খুবই জনপ্রিয়। মঞ্চ নাটক এবং চলচ্চিত্রের সমালোচনা করতেন প্রায় নবাগত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ''সে সব সমালোচনা মামুলি হিজিবিজি নয়, সেটা ব্যবসাদারি চোখের কটাক্ষপাত। সেটা একটা আলাদা কারুকার্য। নৃপেন তার আবেগ-গম্ভীর ভাষায় 'সীতা'-র সমালোচনা করলে— সমালোচককে নিয়ে গোটা কবিতার পর্যায়ে।'' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ, পৃ. ১০১)।

সব মিলিয়ে 'বিজলী' ছিল বিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের সাড়াজাগানো একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকা। প্রবীণদের সঙ্গে সঙ্গে নবীন যুগে পা দেওয়া তরুণ লেখকদেরও সসম্মানে বুকে টেনে নিয়েছিল 'বিজলী'। অন্যান্যদের মধ্যে কবি সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ও একসময় 'বিজলী' সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে 'বিজলী' দীর্ঘজীবী ছিল না। বিজলির চমকের মতোই বাংলা পত্রপত্রিকার গগন থেকে হঠাৎ-ই অদৃশ্য হয় 'বিজলী' সম্ভবত ১৩৩২ সালে। □

শ্রীরামকৃষ্ণের তুলসীপ্রীতি এবং কাঁকুড়গাছির তুলসীকানন

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৫ সালের ২২ এপ্রিল জানিয়েছিলেন তাঁর ধ্যানের অনুভূতির কথা। মা তখন তাঁর ভেদবুদ্ধি একেবারেই দূর করে দিয়েছিলেন— সজনে তুলসী এক বোধ হতো। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ- পার্ষদ রামচন্দ্র দত্তের 'নতুন বাগান'-এ গিয়ে অপূর্ব তুলসী-কানন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। আজও কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে তুলসীমঞ্চের সামনে দাঁড়ালে এক লহমায় ১৮৮৩ সালের ২৬ ডিসেম্বরের দিনটি ভক্তদের কাছে জীবন্ত ইতিহাস হয়ে ধরা দেয়।

বাংলা ভাষায় একটি কথা আছে, 'তুলসীতে তুলসীতে বৃন্দাবন'। যদি কোনো বাড়ির উদ্যানে বিস্তৃত পরিসরে তুলসীমঞ্জরীর পরিণত বীজ ক্রমাগত মাটিতে পড়ে অসংখ্য চারা সৃষ্টি হয় এবং তা তুলসীর শ্যামলীমায়, ঐশী সৌগন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে, তখন সেই বাড়ির সম্পর্কে এমন কথা বলা চলে। অর্থাৎ, তুলসীর বন যেন 'বৃন্দাবন' পদবাচ্য। যেখানে তুলসী, সেখানেই বৃন্দাবন। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার তাঁর গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির নতুন বাগানে উপস্থিত হয়ে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি গ্রন্থে তার সবিশেষ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়—

'সব কর্মে সদাশয় রাম আগুয়ান।
কাঁকুড়গাছিতে আছে তাঁহার বাগান।।
সেইখানে বহুপূর্বে প্রভুর গমন।
মনের মতন স্থান অতি নিরজন।।
তুলসীকানন এক তাহার ভিতর।
দেখিয়া বড়োই খুশী প্রভু গুণধর।।
ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই ঠাঁই বারবার।
স্থানের মাহাত্ম্য-গুণে কৈলা নমস্কার।।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর সেই কাননের মধ্যেই মহাসমাধি রচিত হোক, স্বীকৃত হয়েছিলেন রামচন্দ্র। আগ্রহী হলেন, সেখানেই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ সন্ন্যাসীরা অবস্থান করে মঠ স্থাপন করেন—

'রাম কহে তুলসী-কানন অংশ যত।
সমাধির তরে দিব হইনু স্বীকৃত।।
সন্ন্যাসীরা রহে যদি বাগানভিতর।
সমর্পণ করিব আছয়ে এক ঘর।।'

কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্রের বাগানে তুলসীকাননের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থিকলস সমাহিত করলেন গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তেরা। তার উপর বেদী নির্মাণ করে মন্দির স্থাপিত হলো এবং নিত্য ভোগ-রাগ যথাবিহিত পালিত হতে শুরু করল—

'কলসী ধরিয়া শিরে সহ সংকীর্তনে।
চলিল কাঁকুড়গাছি রামের বাগানে।।
তুলসীকানন যেথা স্থান মনোহর।
কলসী সমাধিতে গর্তের ভিতর।।
তবে তদুপরি করি বেদির সূচনা।
ক্রমশঃ হইল পরে মন্দির স্থাপনা।।

এইভাবে তুলসীকাননের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি নিকট সংযোগ লক্ষ্য করা গেল। শ্রীম-কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পঞ্চম ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রের নতুন বাগান দেখতে শ্রীরামকৃষ্ণ মণিলাল মল্লিক-সহ ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের এক বুধবার। গাড়ি থেকে অবতরণ করে বাগানে পৌঁছে রাম এবং ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর প্রথমে তুলসী-কানন দর্শন করতে গেলেন। এই তুলসীর বন দেখে ঠাকুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'বাঃ, বেশ জায়গা, এখানে বেশ ঈশ্বর চিন্তা হয়।' তারপর ঠাকুর বাগানের অভ্যন্তরে বৃহৎ পুষ্করিণী (সরোবর)-র দক্ষিণের ঘরে এসে বসলেন। রামচন্দ্র ঠাকুরকে থালায় করে নিবেদন করলেন বেদানা, কমলালেবু এবং কিছু মিষ্টি। ঠাকুর আনন্দের সঙ্গে তা ভক্তদের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। এই বাগানটি সেদিন ভালোভাবে পরিক্রমা করেছিলেন ঠাকুর। বাগান দর্শনের পর তিনি সুরেন্দ্রের বাগানে যান।

দেশীয় সংস্কৃতির সমীপ্যে-সান্নিধ্যে তুলসীমঞ্চ স্থাপিত হোক পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে, তুলসীপূজন মঞ্চ থেকে নানান সংগঠন এই বার্তাই দিয়েছেন। এমনকী তুলসীর চারা ডাবের খোলায় তৈরি করে বাড়ি বাড়ি টবে, তুলসীমঞ্চে, মাটিতে লাগানোর কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে। তুলসীগাছ তৈরির জন্য নানাস্থান কেয়ারি তৈরি করে বীজ ফেলা যেতে পারে। বীজ সংগ্রহ অভিযান চালাতে হবে। বাড়ি বাড়ি তুলসীর গাছ থেকে স্থানীয়ভাবে বীজ সংগ্রহ করা যায়। গ্রীষ্মে কেয়ারি তৈরি করার উদ্যোগ নিলে বর্ষার প্রথমে উপযুক্ত দিনে অথবা রথযাত্রার দিন প্রচার করে তা বাড়িতে বাড়িতে বিতরণ করা যায়। ডাবের খোলায় গোবর সার/জৈব সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে শিশু চারা। বাড়ির উপযুক্ত স্থানে তুলসীগাছ লাগিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করার পরিকল্পনা করা যায়, যেখানে রোদ আসে, নিয়মিত সামান্য জল দেবার সুবিধা আছে— এমন স্থানে, ছাদে, বারান্দায়, জানালা-বাগানে তুলসীমঞ্চে।

বাড়িতে তুলসীগাছের অধিষ্ঠান কেবল হিন্দু ঐতিহ্য নয়, তার নানান ভেষজ ও পরিবেশগত ব্যবহারও সুপ্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে তুলসীগাছ ফিরে আসুক। সকল সম্প্রদায়ের মানুষই তুলসীগাছকে প্রকৃতির এক অমূল্য দান মনে করে তার লোকায়ত ব্যবহার করুন। পরিবেশকে নির্মল রাখুন।

তথ্যসূত্র : ১. অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী প্রভানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। ২. শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, অক্ষয়কুমার সেন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

পরিবর্তনের ঢেউ : ইরান থেকে ভারত, গাজওয়া-এ-হিন্দের মিথ এবং আধুনিকতার আহ্বান

বরুণ মণ্ডল

সম্প্রতি ইরানে যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে, তা কেবল একটি দেশের অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিফলন নয়, বরং বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় চিন্তাধারার এক গভীর পরিবর্তনের সংকেত। গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া প্রতিবাদে, যা এখন ১৮০টিরও বেশি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রতিবাদকারীরা অন্তত ২৫টি মসজিদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনাগুলোর মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক পতন, মুদ্রাস্ফীতি এবং সরকারি দমননীতি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যারা এই মসজিদগুলোতে আগুন দিচ্ছে, তারা নিজেরাই মুসলমান— যদিও তারা ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান দাবি করেছেন যে এর পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের হাত রয়েছে, যারা 'সন্ত্রাসীদের' পাঠিয়েছে। কিন্তু রয়টার্স ও বিবিসির মতো সূত্র থেকে জানা যায়, এই প্রতিবাদগুলো স্থানীয় অসন্তোষ থেকে উদ্ভূত, যা ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট সত্ত্বেও অব্যাহত। এমনকী তেহরানের সাদাত আবাদ এবং গোলহাক এলাকায় মসজিদগুলোকে টার্গেট করা হয়েছে, যা ইসলামিক শাসনের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মজহবি কট্টরতার বিরুদ্ধে স্থানীয় মুসলমানরাই বিদ্রোহ করছে।

এই পরিবর্তন কেবল ইরানে সীমাবদ্ধ নয়। সারা বিশ্বে 'এক্স-মুসলিম' বা মজহব-ত্যাগী মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০২৫-এর তথ্য অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান পরিবারে জন্ম নেওয়া ২৩ শতাংশ লোক নিজেদের আর মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে না; প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ মুসলমান মজহব ত্যাগ করছে। ইউরোপে, ফ্রান্সে ১৫ হাজার ও ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে অনুরূপ সংখ্যা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতে এই প্রবণতা আরও উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোরানের বাণী নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, যা ইসলামিক স্কলারদের মধ্যেও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ভারতে, পিউ-এর ২০২১-এর সমীক্ষায় ৬ শতাংশ মুসলমান আল্লায় বিশ্বাস করে না। ভারতের এখন ২০ কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় ১.২ কোটি এক্স-মুসলমান বা মজহব-ত্যাগী মুসলমান। এক্স-প্ল্যাটফর্মে (পূর্বতন ট্যুইটার) বাংলাদেশি এবং ভারতীয় এক্স-মুসলমানদের আলোচনা সবচেয়ে বেশি, যারা মজহবি স্বাধীনতার দাবি তুলছে। ইউরোপে, লন্ডনের পরিস্থিতি ভয়াবহ— মুসলমান অভিবাসীদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের সংঘাত বাড়ছে, যা 'ক্রুসেড'-এর মতো ধারণাকে জাগিয়ে তুলছে। পিউ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০৫০ নাগাদ ইউরোপে মুসলমান সংখ্যা ১০ শতাংশ হবে কিন্তু এক্স-মুসলমানদের বৃদ্ধি এই ভারসাম্য পরিবর্তন করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে 'গাজওয়া-এ-হিন্দ' ধারণাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি একটি হাদিস-ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী, যা ভারত জয়ের কথা বলে। এই ইসলামিক তত্ত্বটি দুর্বল হাদিসের ওপর নির্ভরশীল, যা র‍্যাডিকাল গ্রুপস্ যথা— লস্কর-ই-তৈবা বা জইশ-ই-মোহাম্মদ ভারত-বিরোধী জেহাদের জন্য ব্যবহার করে। বাস্তবে, এটিকে ঐতিহাসিক বা আধ্যাত্মিক যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়, যেমন— ৭১২ খ্রিস্টাব্দের পর প্রায় এক হাজার বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রসার। কিন্তু বর্তমানে ভারতে এটি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হয়। 'গাজওয়া-এ-হিন্দ'-এর মতো মিথকে কেন্দ্র করে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে ভয়ংকর গোঁড়ামি প্রায়ই দেখা যায়, যা দক্ষিণ এশিয়ায় মজহবি মোল্লাবাদের মূল কারণ। সোভিয়েত আক্রমণের সময় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে তালিবানের উত্থান এর উদাহরণ। ভারতে, ধর্মান্তরিতদের মধ্যে র‍্যাডিকালাইজেশন হিন্দু-মুসলমান সংঘাত বাড়ায়, যেমন— সিমি, পিএফআই, এসডিপিআই-এর মতো গ্রুপের জেহাদি কার্যকলাপ।

আশ্চর্যের বিষয়, হজরত মহম্মদের বংশধররা— সৈয়দ বা হাশেমাইট— তারা কিন্তু আধুনিক জীবনযাপন করছেন। জর্ডনের রাজপরিবারের প্রতিনিধি কিং আবদুল্লা দ্বিতীয়, যিনি মহম্মদের বংশধরদের ৪১তম প্রজন্ম, তিনি সুন্নি হলেও আধুনিক কায়দায় শাসন পরিচালনা করেন। ইয়েমেনের হাদরামাউত থেকে উদ্ভূত বা আলাউই সাদাতরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম ছড়ায়, তারা কিন্তু উন্নত ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। পাকিস্তান ও ভারতে অনেক সৈয়দ আধুনিক পেশায় যুক্ত, যা প্রমাণ করে যে তাদের বংশধরত্ব মজহবি কট্টরতার সঙ্গে যুক্ত নয়।

ভারত ও প্রতিবেশী দেশের ধর্মান্তরিতদের জেনে রাখা দরকার যে, ইরানের মতো ইসলামিক দেশ যদি মুক্তির পথ খোঁজে, তাহলে 'গাজওয়া-এ-হিন্দ'-এর স্বপ্ন দেখা বৃথা। এটি কেবল বিভেদ সৃষ্টি করে। পরিবর্তে, আধুনিক শিক্ষা ও পরধর্মসহিষ্ণুতার অনুশীলন প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী এক্স-মুসলমান বা মজহব-ত্যাগী মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মজহবি গোঁড়ামি আর টিকবে না। শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ভারতীয় মুসলমানদের এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতেই হবে।

ফঃ ৫

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

email : ashokatools@hotmail.com

-: REGD. OFFICE :-

23A, Netaji Subhas Road,

11 th Floor, Room No. 31,

Kolkata-700 001

Phone No. 9331229004

-: FACTORY :-

Santra para, Par Dankuni

Hooghly, Pin- 712310

PHONE : OFFICE : 2231-9166/

PH. 9903853534

With the best Compliments from :

JALAN CHEMICAL & INDUSTRIES PVT. LTD.

Director : Rajesh Jain

27AB Royd Street, Ground Floor
Kolkata-700016
Phone : 22297263 (O) 40017926

ভয়ের রাজনীতি থেকে ফাইল-দখলের মরিয়া চেষ্টা

অরুণ চক্রবর্তী

এক সময় যিনি নিজেকে 'মাটি, মানুষ ও মানুষের নেত্রী' বলে দাবি করেছিলেন, আজ তিনিই যেন আতঙ্কগ্রস্ত এক শাসকের প্রতিচ্ছবি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর ধারাবাহিক তদন্ত অভিযান— কয়লা পাচার কেলেঙ্কারি, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, গোরু পাচার, আবাস যোজনার টাকা চুরি— একটার পর একটা দুর্নীতির পর্দা ফাঁস যখন হচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস যেন ভেঙে পড়েছে। আইপ্যাক-এর মতো পেশাদার ইমেজ ম্যানেজমেন্ট সংস্থার উপর ভর করেও যখন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, তখনই শুরু হয়েছে মরিয়া চেষ্টা— ফাইল দখল, প্রভাব খাটানো, তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা।

ইডি-র রেইড কি তাঁকে এতটাই বিচলিত করেছে যে শাসক হিসেবে সংযম হারিয়ে ফেলেছেন? কয়লা চুরি ও আর্থিক দুর্নীতির ফাইল বাঁচানোর এই তৎপরতা কি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শেষ পেরেক?

১. ক্ষমতার দীর্ঘ পথচলা ও নৈতিক অবক্ষয় :

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাম বিরোধী আন্দোলনের মুখ। পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার ১৪ বছর পার হতেই সেই স্বপ্ন ভেঙে পড়েছে। ক্ষমতা দীর্ঘ হলে যেমন হয়— প্রশাসন দলদাসে পরিণত হয়, পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের ঢাল হয়ে ওঠে, দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। তৃণমূলের শাসনেও ঠিক সেটাই ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে প্রশাসনের সর্বেসর্বা বানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী— সবকিছুর কেন্দ্রে তিনি নিজেই। এর ফল? —চেক অ্যান্ড ব্যালান্স ভেঙে পড়া।

২. কয়লা চুরি কেলেঙ্কারি : শুধু আর্থিক নয়, নৈতিক ধস :

কয়লা পাচার কেলেঙ্কারি পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অন্যতম বড়ো দুর্নীতির অভিযোগ। প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় বছরের পর বছর কয়লা পাচার চলল কীভাবে? পুলিশ, প্রশাসন, স্থানীয় নেতারা কি কিছুই জানতেন না? কোটি কোটি টাকার লেন-দেন কি শীর্ষ নেতৃত্বের অজান্তে সম্ভব? ইডি ও সিবিআই-এর তদন্তে যাদের নাম উঠে এসেছে, তারা কেউ বিরোধী দলের নয়— তারা সবাই তৃণমূল ঘনিষ্ঠ। এখানেই মুখ্যমন্ত্রীর দায় প্রশ্নের মুখে পড়ে।

৩. ইডি-র রেইড ও আইপ্যাকের ব্যর্থতা :

আইপ্যাককে আনা হয়েছিল তৃণমূলের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি নতুন করে গড়ার জন্য। কিন্তু বাস্তবতা বড়ো নির্মম। দুর্নীতির পাহাড় ঢাকতে শুধু স্লোগান যথেষ্ট নয়। 'খেলা হবে' বলে তদন্ত এড়ানো যায় না। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচার দিয়ে ইডি-র নোটিশ থামানো যায় না। ইডি-র রেইডের পর যেভাবে শাসক দলের শীর্ষ মহলে অস্থিরতা দেখা গেল, তাতে স্পষ্ট— ভয় কাজ করছে। আইপ্যাক যতই 'ন্যারেটিভ' সাজাক, সাধারণ মানুষ বুঝে গেছে আসল সত্য।

৪. ফাইল দখলের অভিযোগ : শাসকের সংযমহীন আচরণ :

একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে যে সংযম ও সাংবিধানিক দায়িত্ব প্রত্যাশিত, সাম্প্রতিক ঘটনায় তার ঘোরতর অভাব দেখা গেছে— এমনই অভিযোগ উঠেছে। তদন্ত সংক্রান্ত ফাইল নিয়ে টানাটানি, হস্তক্ষেপ বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা হয়ে থাকে, তবে তা শুধু রাজনৈতিক ব্যর্থতা নয়— এই গণতন্ত্রের উপর আঘাত। একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন তদন্তকারী সংস্থার কাজকে বাধা দেওয়ার মতো আচরণে ওঠেন, তখন প্রশ্ন ওঠে— তিনি কি নিজের নির্দোষিতায় আস্থা রাখেন না?

৫. 'ভয় নেই' বলার রাজনীতি ও বাস্তব আতঙ্ক :

মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেন— 'আমি কাউকে ভয় পাই না।' কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা— বারবার কেন্দ্রকে দোষারোপ করা, তদন্ত সংস্থাকে 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' বলা, মিছিল-মিটিং করে চাপ সৃষ্টি। এসব আসলে ভয়েরই বহিঃপ্রকাশ। নির্দোষ হলে আইনের মুখোমুখি দাঁড়ানোই স্বাভাবিক পথ। কিন্তু এখানেই সমস্যা— আইনের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস নেই বলেই রাজপথে নাটক।

৬. প্রশাসনের রাজনৈতিক অপব্যবহার :

পশ্চিমবঙ্গে আজ— পুলিশ মানেই শাসক দলের ক্যাডার, প্রশাসন মানেই দলীয় নির্দেশ পালনের যন্ত্র, বিরোধী মানেই শত্রু। এই পরিস্থিতিতে ইডি বা সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের শাসকের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে।

৭. শিক্ষিত সমাজ ও তরুণদের বিশ্বাসভঙ্গ :

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সমাজকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছে।

(১) যোগ্যরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হলেন।

(২) অযোগ্য টাকা দিয়ে ঢুকে পড়ল।

(৩) লক্ষ লক্ষ তরুণের ভবিষ্যৎ নষ্ট হলো।

এই ক্ষোভ শুধু বিরোধী রাজনীতি নয়— এটা সামাজিক বিস্ফোরণের ইঙ্গিত।

৮. 'শেষ পেরেক' কেন বলা হচ্ছে?

রাজনৈতিক ইতিহাস বলে— একটা নয়, বহু কেলেঙ্কারি। একটা নয়, বহু তদন্ত—। একটা নয়, বহু ঘনিষ্ঠ নেতার গ্রেপ্তার। —এই সব মিলেই শাসকের পতনের পথ তৈরি হয়। আজ মুখ্যমন্ত্রী সেই পথেই হাঁটছেন। ফাইল দখলের রাজনীতি, তদন্তে বাধা, আতঙ্কিত বক্তব্য— সব মিলিয়ে এটাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে দুর্বল সময়।

ক্ষমতা দিয়ে ইতিহাস লেখা যায়। প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়— নৈতিকতার ভিত্তিতে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতায়, জনগণের বিশ্বাসে। মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যিই নির্দোষ হন, তবে তদন্তকে স্বাগত জানান। আর যদি না হন— তবে যতই ফাইল ছিনিয়ে নেওয়া হোক, যতই আইপ্যাক দিয়ে ইমেজ পালিশ করা হোক— দুর্নীতির শেষ পেরেকটা ইতিমধ্যেই বসে গেছে। ইতিহাস অপেক্ষা করছে। জনগণ দেখছে। আর সত্য— শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেতেই হবে। □

BANSIDHAR BADRIDAS MODI PRIVATE LTD

EDEN HOUSE

17/1, LANSDOWNE TERRACE

LANSDOWNE MANOHAR PUKUR CROSSING

KOLKATA - 700026

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

With best Compliments from :

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ (৫/৪৬)

BHARAT STEEL INDUSTRIES

190, Girish Ghosh Road, Belurmoth, Howrah

Pin- 711 202

বিশ্বজয়ের উন্মাদনার পরেই ফাঁকা গ্যালারি নির্বাচনের ছায়ায় মহিলা প্রিমিয়ার লিগ

নিলয় সামন্ত

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট এই মুহূর্তে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনায় দাঁড়িয়ে। সদ্য বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে দেশের মহিলা ক্রিকেটাররা শুধুমাত্র একটি ট্রফিই জয় করেননি, তারা জয় করেছেন কোটি কোটি মানুষের মন। এক সময় যে খেলাকে দেখা হতো সীমিত পরিসরের আগ্রহ হিসেবে, আজ সেই মহিলা ক্রিকেটই ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে ঘরের ড্রয়িংরুম থেকে শুরু করে স্টেডিয়ামের গ্যালারি পর্যন্ত। মাঠে বসে খেলা দেখার আগ্রহ বেড়েছে, দর্শকের সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক বেশি। ঠিক এই আবহেই শুরু হওয়ার কথা মহিলা প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরশুম। অথচ সেই আনন্দে হঠাৎই বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াল নির্বাচন।

গত ১৫ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের নবি মুম্বই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌরনিগম নির্বাচন। আর এই নির্বাচনের সময়সূচিই তৈরি করেছে জটিল পরিস্থিতি। নির্বাচন মানেই বাড়তি নিরাপত্তা, প্রশাসনের সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং পুলিশ বাহিনীর পূর্ণ ব্যস্ততা। ফলে বড়ো ক্রীড়া আয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলেই মহিলা প্রিমিয়ার লিগের একাধিক ম্যাচ আয়োজন করা হতে চলেছে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। একটি বিশ্বস্ত ক্রীড়া সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র একটি নয়, এই সপ্তাহে একাধিক ম্যাচ ফাঁকা মাঠে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষ করে ভোটের দিন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স উইমেন ও ইউপি ওয়ারিয়র্স উইমেনের ম্যাচ নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল সবচেয়ে বেশি। পুলিশের তরফে আয়োজক সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সেদিন দর্শকভর্তি মাঠে ম্যাচ আয়োজনের মতো প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে বাধ্য হয়েই ম্যাচ আয়োজন করতে হয়েছে দর্শক ছাড়া।

করোনা অতিমারীর সময় দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের অভিজ্ঞতা সকলেরই মনে আছে। সেই সময় স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে দর্শকদের মাঠে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তখন পরিস্থিতি ছিল একেবারেই আলাদা। কিন্তু এবার কোনো স্বাস্থ্যসংকট নেই। বরং বিশ্বজয়ের পর মহিলা ক্রিকেট ঘিরে মানুষের আগ্রহ ও উন্মাদনা তুঙ্গে। এমন সময় মাঠ ফাঁকা থাকাটা নিঃসন্দেহে হতাশাজনক।

সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন মুম্বই দল এবং অভিজ্ঞ বিদেশি ক্রিকেটার মেগ ল্যানিঙের নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশ দল। দুই

উত্তরপ্রদেশের জয়ের পর হরলীন দেওল ও ক্লোট্রায়ন

শক্তিশালী দলের এই লড়াই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দর্শকে ভরা গ্যালারির দাবি রাখে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ম্যাচটি দর্শকশূন্য মাঠেই আয়োজন করা হবে বলে প্রায় নিশ্চিত।

এই সমস্যার শিকড় রয়েছে সময়সূচির সংঘাতে। গত বছরের ২৯ নভেম্বর মহিলা প্রিমিয়ার লিগের সম্পূর্ণ সূচি প্রকাশ করা হয়েছিল। অর্থাৎ বহু আগেই ম্যাচগুলির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু তার পরেই ১৫ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন নবি মুম্বইয়ের পৌরনিগম নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে। এই দুই সূচির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকাতেই শুরু হয় জটিলতা। আয়োজকদের হাতে খুব বেশি বিকল্প তখন আর খোলা ছিল না। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত মিলছে টিকিট বিক্রির ক্ষেত্র থেকে। গত ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৪, ১৫ ও ১৬ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য ম্যাচগুলির জন্য কোনো টিকিট বিক্রি শুরু হয়নি। সাধারণত এত বড়ো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আগেভাগেই টিকিট বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ফলে টিকিট বিক্রি না হওয়াটা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে— এই ম্যাচগুলি কি আদৌ দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত হবে? অনেকের মতে, এটি দর্শকশূন্য ম্যাচ আয়োজনের দিকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত।

যদিও এই গোটা বিষয়টি নিয়ে আয়োজক সংস্থার তরফে এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের আগের ও পরের দিনগুলিতে যে ম্যাচগুলি রয়েছে, সেগুলিও দর্শকশূন্য মাঠে হবে কিনা, সে বিষয়েও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। পরিস্থিতির উপর নজর রেখে ধাপে ধাপে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

তবে বড়ো প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশ্বজয়ের পর যে সময়টায় মহিলা ক্রিকেট নতুন করে জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছে, সেই সময় মাঠে দর্শক না থাকা কি খেলাটির প্রসারের পথে একটি বড়ো সুযোগ নষ্ট করে দিচ্ছে না? গ্যালারির উচ্ছ্বাস, করতালি আর উৎসাহ খেলোয়াড়দের মানসিক শক্তি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। মহিলা প্রিমিয়ার লিগের মূল লক্ষ্যই ছিল মহিলা ক্রিকেটকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সেখানে ফাঁকা গ্যালারি নিঃসন্দেহে এক বেদনাদায়ক বাস্তবতা।

নির্বাচন শেষ হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, আবার গ্যালারি ভরবে— এই আশাতেই এখন ক্রিকেটপ্রেমীরা দিন গুনছেন। ততদিন পর্যন্ত হয়তো টেলিভিশনের পর্দাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে সেই বিশ্বজয়ের উচ্ছ্বাস। তবু এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, কখনো কখনো প্রশাসনিক বাস্তবতার কাছে খেলাধুলাকেও নীরবে মাথা নত করতে হয়। □

SANHIT POLYMER Pvt. Ltd.

11, POLLOCK STREET, 3RD. FLOOR, ROOM NO. 3B/1

KOLKATA- 700 001, PH. - 033-22350278/79, M.- 9732024706

Factory : Shibtala-Surul Road, Bolpur, Dist. : Birbhum, West Bangal 731204, Phone : +91+3463-234517 / 645017 / 09732024706

APPLICATION

Industry & Packaging

PP - Icecream cup & Container

HDPE LLDPE Tarpaulim

Pond Liner

Pole (Concrete)

Green House

Geomembrane

LDPE Film/Sheet

'CORAL' Water Tank

Disposal Glass & Cup

HDPE Pipe

With Best Compliments From :-

MUKHERJEE ENGINEERING CO.

Manufacturer of

R. C. C. SPUN PIPES, COLLARS & ALLIED ITEMS

Head Office & Workshop

Sriniketan Road, Bolpur, Pin - 731 204

Phone : (03463) 254-215 (O), Mobile : 9434009737, 919434762433

E-mail : mukherjeeengineeringco@yahoo.com Fax : 03463-254215

মানবিকতার নতুন রং দিয়ে বেঁচে থাকার গল্প

দেবনারায়ণ চক্রবর্তী

সাহিত্যিক দেবদাস কুণ্ডু সংকেত প্রয়াসী। মিতবাক। মানুষের অন্তর-চর্চায় তিনি আন্তরিক। দেবীর বীজমন্ত্র উচ্চারণ তাঁর হৃদয় থেকে উদ্‌গত হয়। কিন্তু আগে তো প্রতিমা। মানে গল্পের অবয়ব। প্রাণ প্রতিষ্ঠা, বিষয়বস্তু। আমরা গল্প একটা চাইব সেটা নিটোল হতে হবে। যেটা সাধারণত হয়, সাময়িক পত্রের শব্দসংখ্যার চাবুক ঘোরে মাথার ওপর, তাও লিখতে বসে নানা চরিত্রের সঙ্গে হয় দু'দণ্ড সুখ-দুঃখের কথা বলা। তাদের বন্ধু হয়ে ওঠা। কিন্তু সে আর হয় কই। শব্দ সংখ্যার কথা মনে পড়ে যখন। তখন অসমাপ্তির দুঃখ নিয়েই শেষ করতে হয়।

দেবদাসবাবুর গল্প তীব্র অনুভূতিপ্রবণ। সম্প্রতি তুহিনা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'হৃদয়, কাবেরী ও চন্দন' পুস্তকটি হলো তাঁর রচিত বিভিন্ন ছোটো গল্পের একটি সংকলন গ্রন্থ। গল্পগুলিতে করোনা কালের প্রভাব কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও প্রচণ্ডভাবে রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন গল্পে উঠে এসেছে বিবিধ বর্ণের মানব চরিত্র। যেমন 'ডিউটি' গল্পের সত্যচরণ ব্যক্তিস্বার্থে ডুবে থাকা মানুষ। একদিন তিনি উপলব্ধি করেন, একজন মানুষের কাছে মানুষ যে মানবিক কর্তব্য আশা করে তার কিছুই সত্যচরণ করেননি। বরং কত নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন! বুকের ভেতরটা খালি খালি মনে হয় তাঁর। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা যাবেন। কাপুরুষের মতো তাঁর মৃত্যু হবে। কিন্তু ফুরিয়ে যাওয়া জীবনে আর তো সময়ও নেই যে তিনি কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। মানুষ যদি প্রথমেই তার নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারে তাহলে তো এ সংসার অনেক সুন্দর হতো। মানুষ নিজেকে সংশোধন করতে পারত। কিন্তু জীবন ফুরিয়ে গেলে মানুষের বোধোদয় হয়। তখন আর সময় থাকে না। এই অমোঘ সত্যকে লেখক দেবদাস কুণ্ডু গল্পটিকে উত্তীর্ণ করেছেন।

এমন অনেক সুখপাঠ্য এবং মর্মভেদী অনেক গল্প এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যেমন, 'হৃদয়ের হৃদয়ে', 'এক্সটেনশন লাইফ'— এগুলি যেন এক-একটি 'অন্যভুবন অন্যআকাশ' গল্প। এই সময়ের একটা জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কুশলী কলমে গল্পগুলি লিখেছেন লেখক। স্বল্প পরিসরে হৃদয় বেদনার এক রক্তাক্ত দলিল। একজন বিপন্ন মানুষের গল্প আসলে বাস্তুহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের গল্প হয়ে উঠেছে। মা যখন মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট বার করে দেখালেন তাঁরা কবে পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন, তখন পরম স্বস্তি নিয়ে বিজন ছুটল। কাগজ তো নয় যেন প্রাণ মুঠোয় নিয়ে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি তৈরি করতে।

'জ্যোৎস্না বাড়ি' গল্পে লেখক পুকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। প্রায় জীবিকা হারাতে বসা ভেলপুরি বিক্রেতা যে স্বপ্ন দেখে জীবনবিমার টাকা পেলে সে একটা বাড়ি তৈরি করবে। যে বাড়ি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাবে। সচেতন পাঠক প্রশ্ন করবেন, দু'বছর পর পুকারের ভেলপুরির বিক্রি আরও কমে যাবে। সেই স্বপ্নের বাড়িতে সংসার তার কী করে চলবে! কিন্তু মানুষ তো অত গভীর ভাবনায় যেতে চায় না। সে দুঃখের অন্ধকারে স্বপ্নের আলো জ্বেলে রাখতে চায়!

'সাইকেল তুমি' গল্পে সাইকেল একটি মানুষের জীবন জীবিকার লড়াইয়ের সঙ্গী হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের মতো সাইকেল অবসর নেয় না। সে পরবর্তী প্রজন্মের লড়াইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। অসাধারণ একটি গল্প। 'দু'খানি হাতের তীর্থে'র গল্প একটি স্বার্থপর মানুষ কীভাবে মনুষ্যত্বের মনুমেন্টে উত্তরণ করল তার মর্মস্পর্শী কাহিনি বুনেছেন লেখক। 'মিসিং ডাইরি' গল্পে একটি মানুষ হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় যৌবনের প্রকৃতিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের কারণে। প্রকৃতি প্রেম মানুষকে তার ব্যক্তি জীবনের উর্ধ্বে নিয়ে যায় যেখানে সভ্যতা অপেক্ষা করে মানবিকতার স্পর্শ পাবার জন্য।

'করোনা' আমাদের সম্পর্কগুলো ভেঙে দিয়ে মানব সভ্যতার নগ্নতার উন্মোচন করেছিল। সেই মানচিত্রে লেখক মানবিকতার নতুন রং দিয়ে বেঁচে থাকার চিত্র অঙ্কন করেছেন। সব গল্পগুলো গভীর আর সুখপাঠ্য। আগামীদিনে পুস্তকটি পুনঃপ্রকাশিত হলে বিভিন্ন বানানের শুদ্ধতার বিষয়ে লেখক ও প্রকাশকের আরও একটু যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

পুস্তক : হৃদয়, কাবেরী ও চন্দন। লেখক : দেবদাস কুণ্ডু। প্রকাশক : তুহিনা প্রকাশনী। মূল্য : ২৫০ টাকা।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ভারতীয় সংবিধানের আত্মাকে ধ্বংসের প্রয়াস করেছে কংগ্রেস

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন সাহেবের হুমকি উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং বাংলাদেশের জন্য জয় ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নির্ণায়ক ভূমিকা, ভারত ছাড়িয়ে সারা এশিয়াতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশাল ভাবমূর্তি তৈরি করতে সাহায্য করে। ১৯৭১-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তান ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হয়ে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হয়। এই সাফল্য ছিল একাধারে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সমগ্র ভারতের সাফল্য। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দূরদর্শিতা, সাহসিকতা ও অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত এই সাফল্য সম্ভব ছিল না। দল মত নির্বিশেষে দেশীয় নেতৃত্ব অকপটে একথা স্বীকার করেছেন। অনেকেই আরও এক পা এগিয়ে তাঁকে এশিয়ার মুক্তিসূর্যও বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই দেশে-বিদেশে স্তাবকের দল তৈরি হয়। পদমহিমা ও গুরুত্ব নির্বিশেষে দলের প্রত্যেকেই তখন তাঁকে সমঝে চলতেন।

দেশে তখন জরুরি অবস্থা চলছে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রশস্তিতে কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া বলেছিলেন— 'ইন্দিরাই ভারত, ভারতই ইন্দিরা'। এরকম পরিস্থিতি, তার ওপর যুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭১-এর লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে তিনি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গড়েছিলেন। এরফলে তাঁর মধ্যে ক্ষমতার দম্ভ তৈরি হয়, তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেন। সব ব্যাপারে তাঁর একনায়কসুলভ মনোভাব বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে তাঁর বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে উদ্দীপিত করে, দেশের সমস্ত বিরোধী দল তার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। তখন পৃথিবীজুড়ে চলছিল আর্থিক মন্দা, আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা তেলের মূল্য বৃদ্ধি। তার ফলে এবং ব্যয়বহুল যুদ্ধের অভিঘাতে দেশে বেকারি চরমে পৌঁছায় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া হয়। ফলস্বরূপ তখন কংগ্রেস-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে এবং মানুষকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। অশীতিপর জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন আপামর ভারতবাসী। আসমুদ্রহিমাচল আন্দোলিত হয়। ক্ষমতাগর্বী শ্রীমতী গান্ধী সে সময় বিরোধীদের সামান্যতম ছাড় দিতেও নারাজ।

বিরোধী কণ্ঠকে সম্পূর্ণরূপে অবদমিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তিনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। জরুরি অবস্থা জারির পেছনে তাঁর সাফাই ছিল, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে এবং গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লক্ষ্যে এই জরুরি অবস্থা। যে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে ভারতবাসীর সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার খর্বিত হয়, যেখানে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার, সরকারি নীতি-সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার অধিকার, সংবাদপত্রের অধিকার সহ মানুষের সর্বপ্রকার মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়। এটা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও সরকারি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নির্লজ্জ প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধি দেশের সংবিধানেই রয়েছে। ১৯৭৫-এর আগে ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পটভূমিকায় এবং ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, হিংসাত্মক অভ্যুত্থান কিংবা অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে বা বৈদেশিক আক্রমণ ঘটলে জরুরি অবস্থা জারি করার বিধি

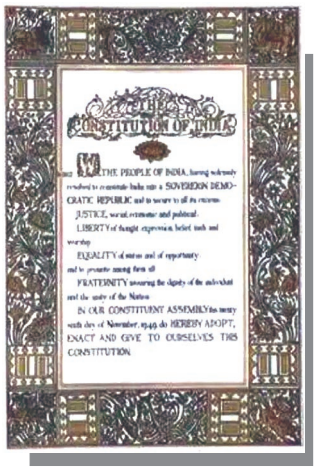

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রীগাভাই খুব মূল্যবান একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—সবার উপরে সংবিধান। এ কথা বলে আইনসভা ও সুপ্রিম কোর্টের দড়ি টানাটানিতে তিনি জল ঢেলে দিতে চেয়েছেন। মূলত সংবিধানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি প্রকারান্তরে সংবিধান রক্ষক সুপ্রিম কোর্টের প্রাধান্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

With Best

Compliments
From

Punjab Glass Depot

With Best Wishes-

UMAYA

Dry-Fruits & Spices
Umaya.contact@gmail.com
M.: 9831126557

With Best Compliments From :-

Hommage Commercial
Private Limited

M. E. M. INDUSTRIES
AN ISO 9001 : 2015 Company
e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor,
18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001,
Phone : 22357998, 22352996,
Mob. : 9830120020

OUR RANGE

- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

Also Sole Distributor
BELDEN (USA)Cables.

রয়েছে। দেশে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার দরুন ১৯৬২ ও ১৯৭১ সালের জরুরি অবস্থা ঘোষণা ছিল যথাযথ। কিন্তু ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা কোনো দিক দিয়েই সমর্থনযোগ্য ছিল না। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়। দেশের বিরোধী সমস্ত দলের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কারারুদ্ধ হওয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন---অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবাণী, নানাজী দেশমুখ বলরাজ মাধোক, মোরারজী দেশাই, চৌধুরী চরণ সিংহ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, জর্জ ফার্নান্ডেজ, সুরজিৎ সিংহ বারনালা, করিয়া মুণ্ডা, এম করুণানিধি প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ এবং বরুণ সেনগুপ্তকেও কারান্তরালে থাকতে হয়েছে। এমনকী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজীকেও গ্রেপ্তার কর হয়। ক্রমান্বয়ে ছ' মাস অন্তর পার্লামেন্টে জরুরি অবস্থার সময়কাল বৃদ্ধি করা হয় এবং তা সুদীর্ঘ একুশ মাস ধরে চলতে থাকে। সেই সময় বিরোধীশূন্য লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৪২তম সংশোধনী এনে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেকুলার' এবং 'সোশ্যালিস্ট' শব্দ দুটির অনুপ্রবেশ ঘটান।

ভারতের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল---ভারত এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। এছাড়া মূল সংবিধানে এমন অনেক অনুচ্ছেদ লিপিবদ্ধ হয়েছে যার বলে যে কোনো ব্যক্তি তার ধর্মমত অনুশীলন করতে পারেন। এই অধিকারের কথা তো সংবিধানের মৌলিক অধিকারে বলা হয়েছে। তথাপি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীমতী গান্ধী সেকুলারের মতো একটা বিদেশি ধারণাকে সংবিধানে ঢোকান যা মূলত ধর্মীয় নিষ্পৃহতাকেই উৎসাহিত করে। সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পদে ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ এবং দেশীয় সম্পদের সরকারীকরণ; দেশীয় জনগণের হিতাহিত, ভালো-মন্দ সমস্ত কিছুর দায় দায়িত্ব সরকারের। এই লক্ষ্যে যে ভারতের সংবিধানে বহু কথা থাকলেও তাঁর খামখেয়ালিপনায় সোশ্যালিস্ট কথাটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংবিধানের কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র।

সংবিধানের ৩২ নং ধারায়, ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে সংবিধানের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সংবিধান বিরোধী কোনো আইন কেন্দ্র বা রাজ্য আইন সভায় পাশ হলে তা বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে অথবা আইনসভা কোনো আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিলে তা সংবিধানের আলোকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার অধিকারী একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট। সংবিধানের মৌলিক কাঠামো অবিকৃত রেখে যে কোনো সংশোধনী আনা যায় নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্যের অনুমোদনে। পার্লামেন্ট যদি আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্র হয়ে থাকে, সুপ্রিম কোর্ট তাহলে তা ব্যাখ্যা ও বিচার করার জায়গা। সাম্প্রতিককালে আইন সভায় পাশ হওয়া অনেক বিতর্কিত আইন সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু সেগুলো সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর কোনোরূপ ক্ষতি করেনি, তাই সুপ্রিম কোর্ট এই আইনগুলোর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ করতে পারেনি। আমাদের দেশে সংবিধান কার্যকরী হওয়া থেকে, চিরকাল সুপ্রিম কোর্ট এবং পার্লামেন্টের মধ্যে একটা দড়ি টানাটানি চলে আসছে। কিছুদিন আগে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বললেন—নির্বাচিত সরকারই গণতন্ত্রের আসল মুখ। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ৫০ বছর উদ্‌যাপিত হয়েছে বিতর্ক, আলোচনা সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রীগাভাই খুব মূল্যবান একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—সবার উপরে সংবিধান। এ কথা বলে আইনসভা ও সুপ্রিম কোর্টের এই দড়ি টানাটানিতে তিনি জল ঢেলে দিতে চেয়েছেন। মূলত সংবিধানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি প্রকারান্তরে সংবিধান রক্ষক সুপ্রিম কোর্টের প্রাধান্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ১৯৭৩ সালের কেশবানন্দ ভারতী বনাম ভারত সরকারের মামলার রায়ে বলা হয়—ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে মানুষের আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংবিধানের যেকোনো ধারা সংশোধনযোগ্য। কিন্তু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে এরকম ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট সেই আইনকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। এ পর্যন্ত ভারতের প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় স্তরে পাশ হওয়া বহু আইন সংবিধানসম্মত না হওয়ার দরুন সর্বোচ্চ আদালত দ্বারা বাতিল হয়েছে। বিশেষ করে তুষ্টীকরণের লক্ষ্যে সংরক্ষণ ইস্যুতে পাশ হওয়া আইনগুলো এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাস, দাঙ্গা নিরোধী অনেক আইন বাতিল হয়েছে। এভাবে সরকারগুলোর অসাংবিধানিক পদক্ষেপকে আটকে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের মর্যাদা ও গুরুত্ব অটুট রেখেছে। ১০২তম সংবিধান সংশোধনী অনুযায়ী ২০১১-র পর রাজ্য সরকার আইনসভায় আইন এনে ২০১০ পর্যন্ত স্বীকৃত ও চালু ওবিসি তালিকায় আরও বহু সাব কাস্টকে (এদের প্রায় সবগুলোই মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত) ওবিসি তালিকায় যুক্ত করে। এ নিয়ে দীর্ঘদিন আগেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা মামলা হয়। সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আপাতত ২০১০ পর্যন্ত যে ওবিসি তালিকা ছিল তাকেই আইনগত মান্যতা দেওয়া হয়। ন্যাশনাল প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা পাওয়া কোনো চাকুরিজীবীর সাংবিধানিক অধিকার নয়, কিন্তু আইনগত অধিকার। তথাপি সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের উপযুক্ত হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, কয়েক কিস্তিতে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। সঠিক মহার্ঘ ভাতা পাওয়া রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার। মূলত প্রচলিত আইনকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর কারণে সুপ্রিম কোর্ট এইভাবে কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে।

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত

দুলালের®

তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।

সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারায় নির্দেশমূলক নীতিতে দেশের নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল কংগ্রেস। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবিষয়ে কর্ণপাত করেনি। যার জন্য দেশে সামগ্রিকভাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আজও চালু হয়নি। এটিও এক ধরনের সংবিধান হত্যা। সাম্প্রতিককালে ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের আইনসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল আইনি মর্যাদা পেয়েছে। মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর বিরুদ্ধে গিয়ে রাজ্যের পক্ষে অভিন্ন দেওয়ানি আইন প্রণয়ন ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এটি এক নজিরবিহীন ঘটনা। অবশ্য ওই রাজ্যে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই আইনের বিরুদ্ধে বিশেষ একটা ক্ষোভ বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়নি। এর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে।

শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী রায়ের প্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সালে মুসলিম মহিলা অধিকার আইন The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act পাশ হয় যা ছিল section 125 Cr Pc -র অধীনে। বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা অর্থাৎ BNSS-এর অধীন ১৪৪ নম্বর ধারায় এটি সংশোধিত হয়ে সংযুক্ত হয়েছে। স্বামী পরিত্যক্তা ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে যেকেনো মহিলা স্বামীর থেকে খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী। সমগ্র দেশে সকলের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি আইন না থাকা সংবিধানকে অস্বীকার করার নামান্তর।

১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার অবতারণার মাধ্যমে এই লেখাটির সূত্রপাত হয়েছে। জরুরি অবস্থা ছাড়া ভারতীয় সংবিধানে আরেক প্রকারের জরুরি অবস্থার বিধি আছে যা লাগু হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। একে রাজ্যে কার্যকরী রাষ্ট্রপতি শাসনও বলে। কোনো রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে অর্থাৎ রাজ্য সরকার সংবিধান মোতাবেক চলতে ব্যর্থ হলো সেখানে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে আজ পর্যন্ত ১৩৪ বার এই ধারা বিভিন্ন রাজ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম অকংগ্রেসি রাজ্য সরকার কেরালার কমিউনিস্ট সরকারকে ফেলে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন; কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সেদিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনো প্রাদেশিক সরকারকে এভাবে ভেঙে দেওয়া সমর্থন করেনি। সেদিনের বিরোধীরা আজকে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন। সুতরাং ভারতের কোনো অঙ্গরাজ্যে বর্তমানে সাংবিধানিক অচলাবস্থা তৈরি হলেও বর্তমান কেন্দ্র সরকার যে সে পথে হাঁটা দেবে না, এটা পরিষ্কার। কোনো রাজ্যে প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং সীমাহীন সন্ত্রাসের কবলে পড়ে, যখন আইনের শাসন প্রত্যাশী নিরীহ রাজ্যবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখন কেন্দ্র সরকার নিশ্চুপ। সংবিধান এ ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকারের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত কারণেও এই অস্ত্র আজকে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এটাও তো কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সংবিধান হত্যার নামান্তর। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা ভারতবাসী স্বাভাবিকভাবে মেনে না নেওয়ার কারণে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার, কী রাজ্যে কী দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন বা জরুরি অবস্থা বলবৎ করার পক্ষে নয়। তবে এক্ষেত্রে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের একটা কার্যকরী প্রো-অ্যাকটিভ ভূমিকা রয়েছে।

দেশের সুপ্রিম কোর্ট 'চেকস্ অ্যান্ড ব্যালেন্সেস' ও 'সেপারেশন অফ পাওয়ার' ডকট্রিনের মাধ্যমে সংবিধানের তিনটি প্রধান স্তম্ভ— বিচার, আইন ও কার্যনির্বাহী তথা প্রশাসনের এক্তিয়ার ও ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে, অর্থাৎ এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রশাসনিক যথেচ্ছাচার ও প্রভুত্ববাদকে নিয়ন্ত্রণ করে। ওই তিন স্তম্ভের কোনোটি যাতে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী না হয় তার জন্য 'চেকস্ অ্যান্ড ব্যালেন্স নীতি বলে বিচার ব্যবস্থা কোনো রাজ্য সরকারের যে কোনো জনবিরোধী কার্যকলাপ বা নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে suo motu (সুয়ো মোটো) কেস ফাইল করতে পারে। এভাবে ভারতের বিচার ব্যবস্থা নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষকে ন্যায় পাইয়ে দিতে পারে। তবে এও ঠিক যে, সব সময় প্রতিক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার অতিসক্রিয়তাকেও মানুষ ভালোভাবে নেয় না। কেন্দ্র বা কোনো রাজ্যের পক্ষ থেকে গৃহীত কোনো উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপে অনাবশ্যকভাবে নাক গলানো বা অকারণে স্থগিতাদেশ জারির মাধ্যমে তাতে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগও সাম্প্রতিক অতীতে সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে অনেকবার উঠেছে। আদালতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনির্দিষ্টকাল ধরে বিচারাধীন থাকলেও, সেগুলির সমাধানে আদালতের অনীহা ও দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টিও ভারতীয় গণতন্ত্রের কাছে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। □

শোকসংবাদ

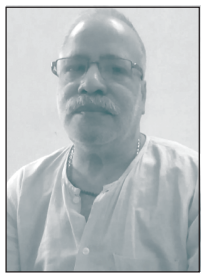

সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের প্রচারক রঞ্জনকান্তি ভুঁইয়া গত ১৯ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তাঁর জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার জকপুরে হলেও তিনি মামাবাড়ি ভাণ্ডারিয়া গ্রামে থাকতেন এবং সেখানেই স্বয়ংসেবক হন। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। তৎকালীন জেলা প্রচারক ধর্মদার (ধর্মচাঁদ নাহার) প্রেরণায় মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বিস্তারক থাকার পর ১৯৮১ সালে প্রচারক বের হন। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলায় খণ্ড, নগর, মহকুমা প্রচারকের দায়িত্ব পালন করার পর উত্তর কলকাতায় সেবা বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। মাঝখানে কাঁথিতেও তাঁর কেন্দ্র ছিল। গত দু'বছর থেকে কেশব ভবনে তিনি থাকতেন। সেখানেই তিনি সেদিন ঘুমের মধ্যেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

With Best Compliments from : -

INDER NAHATA

Rang Rez Sarees (P) Ltd.

Manufacturer of Sarees & Kurti

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road

(Near Park Street Police Station)

2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147, 94330-15473

ACC LOGISTICS

Fleet Owners & Transport Contractors

Registered Government Contractor

40, Girish Park (North),

1st Floor, Suit # 01

Kolkata - 700 006

(Near Calcutta Medicos)

An ISO 9001:2008 Company

Phone : +91 33 40726528, 40036528 E-mail : ashok@acclogistics.in

URL : www.acclogistics.in

bharat

Litho

puts life in printing

98/4, S. N. Banerjee Road
Kolkata - 700 014
(India)
Phone : +91 33 22657862, 22493855
Fax : + 91 22651063
bharatlitho@gmail.com
surendradhote@gmail.com,
www.bharatlitho.com

With Best Compliments

from-

Sindhuja Indocorp Pvt. Ltd.

5, Clive Row, 2nd Floor
Room No. 56
Kolkata - 700 001

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF INDUSTRIAL BLADES

Works

GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR
GOPALPUR, 24 PARGANAS (North), PIN-700 136

Office :

3, Synagogue Street, Room No. 12, 2nd Floor, Kolkata 700 001
PHONE : 22424296/22434571, 033-22421761

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৫৮)

সঙ্ঘময় চিন্তা

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ করে লবণ আইন ভঙ্গ করার পর দেশ জুড়ে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ করে জেলে যাওয়ার উদ্দীপনা শুরু হয়। অনেকে এ বিষয়ে সঙ্ঘের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে ডাক্তারজী জানান সঙ্ঘ এর বিরোধী নয়, ব্যক্তিগতভাবে চাইলে যেকোনো স্বয়ংসেবক সঙ্ঘচালকের অনুমতি নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সঙ্ঘের কাজের দিক থেকে যে রীতি অনুকূল মনে হবে তিনি যেন সেই রীতি অনুসরণ করে এই কাজ করেন। ডাক্তারজী যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, উৎসুক ব্যক্তিরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুক, কিন্তু সঙ্গে এও ভাবলেন সঙ্ঘকার্য অব্যাহত রাখার জন্য কিছু তরুণ কার্যকর্তাকে বাইরে থাকাও প্রয়োজন। অধিকারী শিক্ষা বর্গ শেষ হওয়ার পরে অনেকেই যখন ডাক্তারজীর কাছে সত্যাগ্রহের অনুমতির জন্য আসতেন, ডাক্তারজী তাঁদের জিজ্ঞেস করতেন— 'কত দিনের প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছো?' সাধারণভাবে সবার উত্তর আসতো— 'ছ'মাসের'। ডাক্তারজী আবার জিজ্ঞেস করতেন— 'ছ'মাসের বদলে যদি 'দু'বছরের শাস্তি হয় তাহলে?' কেউ কেউ বলতো— 'তাও ভোগ করব'।

তাদের এবার ডাক্তারজী বলতেন— 'মনে কর তোমার শাস্তি হয়ে গেছে। এই সময়টা সঙ্ঘকাজের জন্য দাও না কেন?' এ কথার সারমর্ম অনুধাবন করে অনেক তরুণ ডাক্তারজীর ইচ্ছারই অনুগামী হতেন। কিন্তু সে সংখ্যা ছিল খুবই কম। ডাক্তারজী বাকি কয়েকশো তরুণকে আন্দোলনে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই ভেবে কষ্টবোধ করছিলেন যে এদের মধ্যে বেশিরভাগই ধ্যেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, সংকল্পের পরিবর্তে— 'আমরাও কিছু করেছি' এটা দেখাবার মনোভাবই বেশি ছিল। তাই অনুমতি দেওয়ার পরে ডাক্তারজী তাদের পরামর্শ দিতেন--- ভাবাবেগের বশে আন্দোলনে না ঝাঁপিয়ে বিচার চিন্তাভাবনা তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য। সে সময় সত্যাগ্রহের অন্য একটি দিকের কথা ডাক্তারজী নিজ দৃষ্টিকোণ অনুসারে ভাবতে শুরু করলেন। তিনি ভাবলেন, এই সত্যাগ্রহে যারা আসবে তারা প্রায় সকলেই দেশভক্তি, ত্যাগব্রতের ভাবনায় পূর্ণ যথার্থ কার্যকর্তা হবে। সকলে একসঙ্গে কারাগারে থাকবে। সঙ্ঘের কাজে তরুণদের গ্রামে গ্রামে খুঁজতে যে পরিশ্রম তার বদলে সহজে দেশভক্তিতে পরিপূর্ণ তরুণদলকে সহজে এক জায়গায় পাওয়া যাবে। সঙ্ঘের কথা বোঝাতে এটা একটা সুযোগই হবে। ডাক্তারজী এবার ভাবতে শুরু করলেন নতুন কথা।

(৫৯)

নতুন সরসঙ্ঘচালক

বিষয়টা অদ্ভুত মনে হলেও সত্যি সত্যি এমন ঘটেছিল। ডাক্তারজী শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা সত্ত্বেও অন্য একজন 'সরসঙ্ঘচালক' রূপে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ঘটনাটা ছিল এরকম। দেশজুড়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনরায় শুরু হওয়ায় অনুমতি নিয়ে বহু স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহ করে জেলে গিয়েছিলেন। আপ্পাজী যোশী দু'-একবার ডাক্তারজীকে বলেন--- 'আমাদেরও সত্যাগ্রহ করে জেলে যাওয়া উচিত'। অধিকারী শিক্ষণ বর্গ চলার কারণে এবং আপ্পাজীর শরীর ঠিক না থাকায় ডাক্তারজী 'পরে ভাবা যাবে' বলে এড়িয়ে যান। বর্গশেষে আপ্পাজী আবার পত্র দিলে ডাক্তারজী সরাসরি লিখে জানালেন— 'আমিও আপনার সঙ্গে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করতে আসছি'। আপ্পাজী ভাবলেন ডাক্তারজী বোধহয় ক্ষুণ্ণ হয়ে এমনটা লিখেছেন। তাই সোজা তিনি নাগপুরে এসে ডাক্তারজীর সব কথা বুঝতে পারলেন। মধ্যপ্রান্তের মানুষদের পক্ষে পাঁচ ছশো মাইল দূরে গিয়ে লবণ সত্যাগ্রহ করা মুশকিল, তাই মধ্যপ্রান্তের পক্ষে জঙ্গল সত্যাগ্রহ করাই উপযুক্ত হবে। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার গবাদি পশুর চারণক্ষেত্রকে বনের সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করে সেখানে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। লোকমান্য তিলকের অনুগামী শ্রীমাধবরাও অণে আগে থেকেই এই জঙ্গল আইনের বিরুদ্ধে নানাভাবে আন্দোলন করে আসছেন।

এই ধরনের আইন করে সরকারি কোষাগারের অর্থ বৃদ্ধির পরিবর্তে কৃষকরা পশু খাদ্য সংগ্রহ, শুকনো পাতা, কাঠ স্বল্প মূল্যে সকলে প্রাপ্ত হোক, এই দাবি নিয়ে আন্দোলন চলছিল। এই আন্দোলনকে তীব্র করার উদ্দেশ্যে শ্রীমাধবরাও অণে দ্বারা জঙ্গল সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। ডাক্তারজী এই জঙ্গল সত্যাগ্রহে যোগদানেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জাক্তারজীর এই সিদ্ধান্তের পরে প্রশ্ন দাঁড়ায় তাঁর অনুপস্থিতিতে সঙ্ঘকাজের সঠিক পরিচালনা কীভাবে হবে! ডাক্তারজী এ বিষয়ে পুরো যোজনা তৈরি করেন। ১৯৩০ সালের ১২ জুলাই গুরুদক্ষিণা উৎসবে ডাক্তারজী এই যোজনার কথা ঘোষণা করে জানান--- নাগপুরের সঙ্ঘকার্য শ্রীবাবাসাহেব আপটে এবং শ্রীবাবুরাও ভেদীর ওপরে অর্পণ করা হলো। এবং ডাঃ পরাঞ্জপের ওপরে আজ থেকে 'সরসঙ্ঘচালক' পদের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে। ডাক্তারজী তাঁর ভাষণে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ এবং নতুন দায়িত্ব বিষয়ে সকলের কাছে সহজ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। উৎসবের সভাপতির ভাষণে ডাক্তার পরাঞ্জপেও সমস্ত স্বয়ংসেবককে আহ্বান জানান— যাদের আগ্রহ তারা আনন্দে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করুন কিন্তু বাকি তরুণ স্বয়ংসেবকরা সঙ্ঘকার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিপূর্ণ নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই ছিল সাময়িক সরসঙ্ঘচালক নিয়োজনের প্রেক্ষাপট।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস